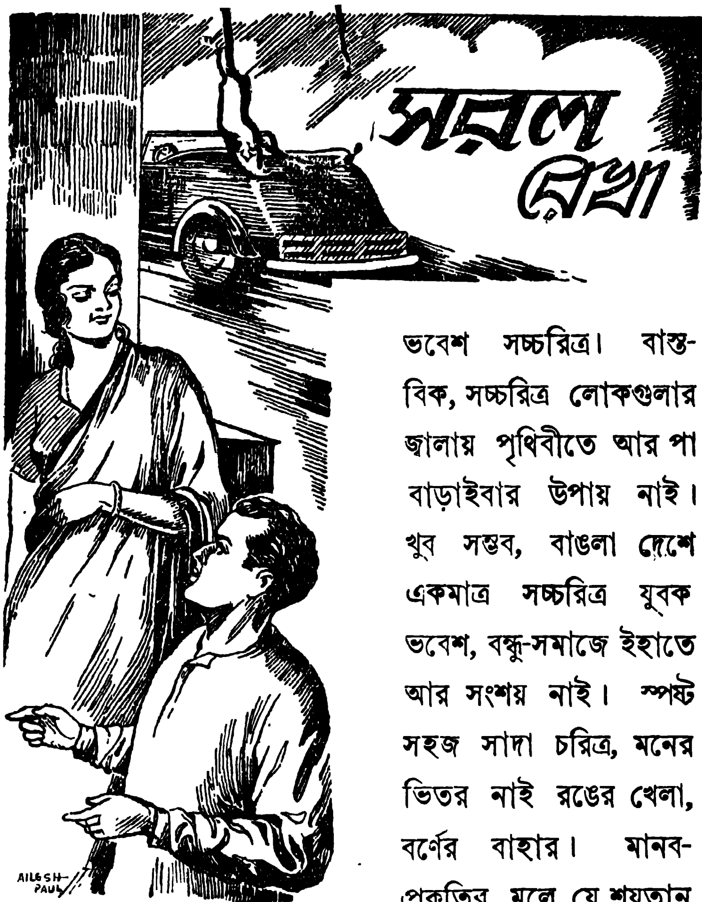
উপহার





ভবেশ সচ্চরিত্র। বাস্তবিক, সচ্চরিত্র লোকগুলার জ্বালায় পৃথিবীতে আর পা বাড়াইবার উপায় নাই। খুব সম্ভব, বাঙলা দেশে একমাত্র সচ্চরিত্র যুবক ভবেশ, বন্ধু-সমাজে ইহাতে আর সংশয় নাই। স্পষ্ট সহজ সাদা চরিত্র, মনের ভিতর নাই রঙের খেলা, বর্ণের বাহার। মানব-প্রকৃতির মূলে যে শয়তান বাসা বাঁধিয়া আছে, সুবিধা পাইলেই সিঁধ কাটে, ভবেশের সহিত পরিচয় হইলে এ তত্ত্ব মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়।

'ওটা ভবেশের নির্ব্বোধ সারল্য, বুঝলেন, টিডিয়স্ য়্যাণ্ড্ বোরিং। এমন একটা হাম্বগ্ এই বিংশ শতাব্দীতে...... হোপ্‌লেস্!'

'পৃথিবীতে সব চেয়ে বড় পরাজয় কাদের ভাগ্যে ঘটেছে জানো, আপন চরিত্রের ভিতর দিয়ে যারা বন্ধের মহিমা প্রচার করেছে……বেচারি ভবেশ !'

'পরস্ত্রীর দিকে তাকায় না এমন ছেলে বাঙলা দেশে একমাত্র ভবেশ, সংসারটা মরুভূমি হয়ে উঠেছে তাদেরই জন্যে যারা নীতিবিদ্ !'

'এই ভবেশ কে জানো ? এ সেই ত্রেতাযুগের হিপোক্রিট্, রাজত্ব করবার লোভে সাধ্বী স্ত্রীকে অকারণে নির্ব্বাসিত করেছিল !'

এমনই কতকগুলি মন্তব্য ভবেশ বন্ধু-সমাজের নিকট শুনিয়া আসিতেছে। বন্ধু-সমাজ মানে নিন্দায় যাহারা মুখর। সত্যি প্রশংসা চাপিয়া মিথ্যা রটনায় যাহারা অক্লান্ত, তাহারাই ভবেশের বন্ধু।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ, স্কলারশিপ, উচ্চশিক্ষার বিস্ময়কর ঔজ্জ্বল্য, পিতার সম্পত্তি, কাঁচা বয়স—কিন্তু অন্যদিকে ? ভবেশ কোমল ও লাজুক, নারীর হৃদয়, বোকার মত বিদ্যার্জ্জনই করিয়াছে।

'বলতে পারেন ভবেশ বিয়ে করল কেন ? বাঙলা দেশে একটি মাত্র বস্তুর দারিদ্র্য নেই, সে বস্তুটি হচ্ছে স্ত্রীলোক ! বেলুড় মঠে যার বাস করা উচিত, সে বাসর ঘরে কেমন করে ঠাঁই পায় বলতে পারেন ? এদেশে চোখ বুজে শুধু একটি কাজই করা চলে—সে হচ্ছে মালা-বদল করা !'

'জাতির দুর্ভাগ্য এখনও কাটেনি, তার কারণ ভবেশের মত ছেলের ভাগ্যেও পাত্রী জোটে।'

'বিয়ে হল ভবেশের একেবারে প্রচলিত প্রথা অনুসারে। সরল সহজ সোজা রাস্তা, পায়ের দাগে দাগে হাঁটা। পরিশ্রম নেই, সংগ্রাম নেই, জয়-পরাজয়ের উত্তেজনা ও অবসাদ নেই, স্পষ্ট অবিকৃত প্রাচীন পন্থা, প্রেম নয়, রোমান্স্ নয়, নেহাৎ বিয়ে, নিতান্তই মালা-বদল।'

সুপুরুষ, নরম ও নধর নয়, পুষ্ট প্রচুর এবং তেজোব্যঞ্জক, পুরাকালের ব্রাহ্মণের প্রতিনিধি! চোখ দুইটা নিষ্কম্প, নির্লিপ্ত, সরোবরের মত আপনাতে উদাসীন। কদম ফুলের মত মাথার সব দিক্ সমান করিয়া ছাঁটা, চুল ছাঁটার মধ্যে তাহার সমস্ত চরিত্রের সাধুতা, রক্ষণশীলতা,—সে মাথা যেন আধুনিক ফ্যাসানের নিঃশব্দ প্রতিবাদ, প্রাচীনের নূতন সংস্করণ। সব চেয়ে চোখে পড়ে ভবেশের বাঁ দিকের গালে একটা বড় আঁচিল, ঠিক ওই যায়গায় অত বড় হইয়া আঁচিল না থাকিলে কিছুতেই ভবেশকে চেনা যাইত না, আঁচিলটাই তাহার মুখের একমাত্র পরিচয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় কঠিনতম প্রশ্নটির উত্তর সে অবলীলাক্রমে লিখিয়া আসিয়াছে তাহার ওই আঁচিলটার উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে। ধন্য ভবেশ! তুমি ছিটের কোট গায়ে দাও, খাটো ধুতি পরো, আর পায়ে ফিতে-বাঁধা জুতো,—চমৎকার, ঠিক তোমার চরিত্রের সঙ্গে খাপ্ খায়, একেবারে নাড়ু-গোপাল। সহস্র যুবকের মধ্যে

ভবেশ একটি বিশেষ, জীব-বিশেষ, কাছে এসে দাঁড়াইলে মনে হইবে সে বুঝি এখনই ভগবৎগীতা শুরু করবে, যুবক-সমাজের ভীতি, প্রাচীন ভারতের প্রতীক।

'তারপর ভবেশ? দেশ থেকে ফিরলে কবে?'

'কাল ফিরেছি, বেশ ছিলাম দেশে।'

'তা ত থাকবেই, অমন স্ত্রী যার। আসবার সময় গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করলেন ত? বল, বিদায়ের গল্পটা বল শুনি।'

হা হা করিয়া ভবেশ হাসিয়া উঠিল। স্বাস্থ্যময় হাসি, হাসিলে তাহার মুখে রক্তের ছোপ লাগে, চোখে আসে কৌতুক।

'ভাবছি দু-একদিনের মধ্যে আবার যাবো, কাজ আছে।'

'দু-একদিনের মধ্যে? বিরহটা সইছে না? ধন্য তুমি ভবেশ, ধন্য। স্ত্রী তোমাকে চরিত্রহীন করেছে, নষ্ট করেছে।'

'তোমরা বুঝবে না আমার স্ত্রী কী। বুঝবে না প্রথম দেখা হলে আমাদের বুকের মধ্যে কী হয়! আমার পৃথিবী ঘোরে তাকে কেন্দ্র করে'।'

'বলে যাও ভবেশ, থেমো না। স্ত্রী-চরিতামৃত বিতরণে তোমার অপরাজেয় প্রতিভা। সংসার-সমুদ্রে পথ হারালে তোমার ত ভয় নেই, তোমার কম্পাসের কাঁটা উন্মুখ হয়ে থাকে স্ত্রীর দিকে, পথ চিনে ফিরে যেতে পারবে। ক'বছর বিয়ে হয়েছে ভবেশ?'

'পাঁচ বছর।'

'অর্থাৎ তোমার স্ত্রীর বয়স' তখন বারো! এই পাঁচ বছর ধরে স্ত্রীকে তোমার ভাল লাগছে ভবেশ?'

'কী যে বল তোমরা!'

'কিছুই বলিনে, তোমার এই অদ্ভুত আসক্তি আমাদের সৎপথে চালিত করুক, এই প্রার্থনা করি।'

ভবেশ কহিল, 'তোমরা বিদ্রূপ করো, সইবে, কিন্তু জেনো এত বড় আশ্রয় মানুষের আর নেই। স্ত্রীর প্রতি আমার যে অদ্ভুত আসক্তি তোমরা বলছ, সেটা তোমাদের ভাষায় প্রেম নয়, ভাবরূপ, আইডিয়া।'

'থেমো না ভবেশ, বলে যাও!'

হাসিয়া ভবেশ পুনরায় কহিল, 'না, আর বলব না। মাতৃ-স্নেহ আর পত্নীপ্রেম—এদের নিয়ে গল্প হয় না, কেন জানো? এদের তলদেশে মানুষের মন পৌঁছয় না।'

'আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য করলে ভবেশ, তুমি বিংশ শতাব্দীর প্রতিবাদ। তোমার মুখের পরে একটা গভীর তৃপ্তির আনন্দ, তুমি সমস্ত জীবনের পাথেয় পেয়ে গেছ, তোমার বিধাতা তোমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েছেন; আর কি, এবার মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও?'

'ভুল করছ' ভবেশ কহিল, 'এইবারেই সত্যিকারের জীবন আরম্ভ; তপস্যার আসন পেলাম, এগিয়ে যাবার প্রথম পদক্ষেপ। তোমাদের অস্থিতি, তাই তোমাদের অতৃপ্তি।'

'ঠিক বলেছ ভবেশ, অস্থিতি, তাই অতৃপ্তি! কে বলেছে

অতৃপ্তিই জীবনের চরমতম রূপ? যে বলেছে দুঃখ আর চোখের জলের মধ্যে অপমানের অন্ন গ্রহণ না করলে সৃষ্টি-লীলার রহস্য বোঝা যায় না? মিথ্যাবাদী তারা, বুঝলে ভবেশ, সে হতভাগ্যরা বুঝবে না তোমার এই ভাবস্থিতি, তুমিই প্রকৃত ভারত-সন্তান, এই হতভাগ্য দেশের······বেশ, তোমার স্ত্রীর গল্প মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিও।'

'তোমাদের বিদ্রূপ আমার সইবে। আজ চারিদিকে চল্‌ছে অসচ্চরিত্রের বিজ্ঞাপন, ধর্ম্মনাশের আনন্দ। মানুষ যে সুবিধে পেলেই পশু-চরিত্র হয়ে ওঠে, তার প্রমাণ বর্ত্তমান যুগ। মহা-মানব জন্মায়, ধর্ম্ম আন্দোলন জাগে সে শুধু মানুষেরই জন্যে। মানুষ আসলে দেবতাও নয়, মানুষও নয়, তারা পশু।'

'ধন্য ভবেশ, ধন্য তোমার স্ত্রী। স্ত্রী তোমাকে ছোটখাটো একটা ধর্ম্মপ্রচারক বানিয়েছে। ছাব্বিশ বছরে তুমি এই! ছাপ্পান্ন বছরে তুমিই হবে মহাত্মা। জয় ভারত-ললনা! বন্দে মাতরম্!'

বন্ধুরা চলিয়া গেল।

ভবেশ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এ যুগের অধঃপতন সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিল।

প্রথম শীতের হাওয়ায় গ্রামের পথে ধূলা উড়িতেছিল। উপরে পরিচ্ছন্ন আকাশ কোমল নীল, কোথাও কোথাও এক

এক খণ্ড লঘু শুভ্র মেঘ ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারই নীচে দূর বিস্তার ধানের ক্ষেত দিগন্ত-বনচ্ছায়ায় গিয়া মিশিয়াছে। মাঝে মাঝে দুই-একটা রঙিন প্রজাপতি উজ্জ্বল রৌদ্র-কিরণে চিক্ চিক্ করিয়া উঠিতেছিল।

পল্লীপথ নীরব জনহীন। দুই ধারের বিবর্ণ কাশ ও ফনী-মনসার জঙ্গলের ভিতর দিয়া গরুর গাড়ী চলিতেছিল। গাড়োয়ান এক হাতে দড়ি ধরিয়া আর এক হাতে তামাক টানিতেছিল। ছইয়ের মধ্যে ভবেশ ও মায়া পাশাপাশি আড় হইয়া শুইয়া রহিয়াছে, তাহাদের গায়ের তলায় খড়ের বিছানা পাতা। হেঁচকাইয়া দোলাইয়া কাৎ হইয়া মন্থর গতিতে গরুর গাড়ী মাঠের উপর দিয়া চলিতেছে।

মায়া গ্রামের মেয়ে নয়, তাই ম্যালেরিয়া মশা অস্বাস্থ্য ও পল্লীসমাজ পার হইয়া তাহার চোখে এখনও গ্রামের সৌন্দর্য্য জ্বল্‌জ্বল্ করে। ছইয়ের ভিতর দিয়া সে ধান-ক্ষেতের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল।

'এর মধ্যে পায়ে আল্‌তা কখন্ পরলে ? টুক্ টুক্ করছে।'

মায়া কহিল, 'হরিসাধনের মা ছাড়ল না, নখ কেটে পায়ে আল্‌তা দিয়ে দিল, কাপড় আদায় করার ফন্দি।'

ভবেশ কহিল, 'চান করে কিন্তু ভাল করনি, আবার যদি জ্বর আসে ?'

'এলেই বা, ম্যালেরিয়া জ্বরকে আমি চিনেছি, কুইনিন, ভাত আর কলের জল—এই ওর ওষুধ।'

'কলকাতায় গেলেই সেরে যাবে, শীতকালের কলকাতা গরম কালের দার্জ্জিলিং, দেখো তোমার শরীর ভাল হয়ে যাবে। এখন কিছুদিন আর শ্বশুরবাড়ী আসতে চেওনা মায়া।'

'বারে, মেয়েমানুষ শ্বশুড়বাড়ী ছাড়া থাকবে কোথায়?'

ভবেশ হাসিয়া কহিল, 'তুমি শহরের মেয়ে, কিন্তু চরিত্রটা তোমার গ্রামের।'

'যাই বল, বাপেব বাড়ী থাকতে আমার····· দেখ দেখ, শালিক পাখী দুটি কেমন গায়ে গায়ে আদর কাড়াচ্ছে? হ্যাখো লক্ষ্মীটি!'

গলা বাড়াইয়া মায়ার মুখের পাশ দিয়া ভবেশ সেইদিকে তাকাইল।

'ওই যা, গাড়ীর শব্দে পালিয়ে গেল!'

কিছুক্ষণ পরে মায়া কহিল, 'আর কতখানি গো?'

'এখনো দেড় কোশ প্রায়।'

'আচ্ছা, এবার বেশ ভাল বাড়ী ভাড়া করেছ ত, বেশ আলো হাওয়া—কলের ঘর আছে ত?'

'সব আছে, বাড়ীটা কিন্তু একটু বড়।'

'বড়? বড় আমার কিন্তু পছন্দ নয় বাপু! বেশ ছোট-খাটো হবে, তিন-চারখানা ঘর, নাগালের মধ্যে···মোটে ত দু'জন, অত বড় বাড়ী—' বলিয়া সে বাহিরের দিকে তাকাইল। পশ্চাতের পথ ও গ্রাম তখন গরুর পায়ের ধূলায় প্রায় অদৃশ্য হইয়া আসিয়াছে।

'যাবার আগেই বলে রাখি, কাজকর্ম্ম তোমার একটিও করা হবে না, সুস্থ শরীরে করতে আমি ত আর মানা করিনি—সেবারের মতন যেন…'

'সে বাপু আমি পারিনে তা তুমি যাই বল, পরিশ্রম করব না ত সংসারে এলাম কি জন্যে? অন্য লোকের হাতে গোছানো ঘর আমার পছন্দ হয় না' বলিয়া মায়া নিজের কথাতেই একটু-খানি স্নিগ্ধ হাসি হাসিল।

'আচ্ছা লোক যা হোক। ওঠো দেখি একবার, খড়গুলো সরে গেছে।'

মায়া ঘাড় তুলিয়া কাৎ হইয়া বসিল। খড়গুলি ভাল করিয়া বিছাইয়া দিয়া ভবেশ কহিল, 'এবার শোও।'

শুইতে গিয়া স্বামীর গায়ে পা ঠেকিয়া গেল। মায়া আবার তাড়াতাড়ি উঠিয়া হাত বাড়াইয়া ভবেশের পায়ের ধূলা মাথায় লইল।

অনেক দূর পথ এমনি করিয়া আসিয়া অপরাহ্ণ-বেলায় গরুর গাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছিল। গাছ-পালায় তখন রোদ উঠিয়াছে।

জিনিষপত্র নামাইয়া ভবেশ গিয়া দুইখানা কলিকাতার টিকিট কিনিয়া অনিল। গাড়ী আসিয়া দুই মিনিট মাত্র দাঁড়াইবে!

'ষ্টেশন দেখলেই আমার কি ইচ্ছে করে জান? ইচ্ছে হয় অনেক দূরে চলে যাই, যতদূর গেছে এই পথ। তা বলে মনে করো না একলা যাবো, তুমি থাকলে বেশ হয়।'

ভবেশ তাহার আজগুবি ইচ্ছা শুনিয়া হাসিতে লাগিল।— বলিল, 'আমার ইচ্ছেটা উল্‌টো, কোথাও না গিয়ে একটা ঘরে চুপ করে দু'জনে বসে থাকি!'

'সত্যি সেই সব চেয়ে ভাল। ঘুরে ঘুরে লাভ কী, কেবল ঘোরাই সার!' মায়ার নিশ্চিত ধারণা হইয়া গেল, কোথাও না ঘুরিয়া ঘরের ভিতর থাকাই সব চেয়ে ভাল।

কথা বলিতে বলিতে এমন সময় ট্রেণ আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ীতে ভিড় নাই, অনেক জায়গা পড়িয়া আছে, দুইজনে উঠিয়া ভিতরে বসিল।

কোথাও ইহাদের আতিশয্য নাই, অত্যন্ত সাধারণ, অত্যন্ত স্বাভাবিক।

পরদিন সকালে তাহারা কলিকাতার বাসায় আসিয়া পৌঁছিল। সাজানো ঘর, পাতা উনুন, রাঁধুনি বামুন এবং ঝি মিলিয়া একদিকের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছে, কোন কষ্ট হইল না! ভিতরে ঢুকিয়া ভবেশ দেখিল রান্না চড়িয়াছে।

শুইবার ঘরে খাটে বিছানা পাতা, মুখ ধুইয়া কাপড় কাচিয়া মায়াকে বিছানায় আসিয়া শুইতে হইল, কাল রাতে ট্রেণেই তাহার জ্বর বাড়িয়াছে। ম্যালেরিয়া জ্বরের মত বিশ্বাসঘাতক আর কোন রোগ নাই। ভবেশ ডাক্তার আনিতে গেল।

তিন দিন পরে মায়া আবার উঠিয়া বসিল। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত দেহ, বসিয়া বসিয়া হাঁপাইতেছে।

'ভূতের দৌরাত্ম্যি, বাবারে—' বলিয়া সে একটু শীর্ণ হাসি হাসিল।

তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া গভীর স্নেহে ম্লানমুখে ভবেশ কেবল বলিল, 'এবার একটু ফলের রস খাও, কী চেহারা হলো তোমার ?'

মায়া একটু লজ্জিত হইল। বলিল, 'তোমারো ত তিনদিন ঘুম নেই, মুখে কালি পড়েছে। সকাল সকাল নেয়ে-খেয়ে বরং একটু ঘুমোও। ভাঁড়ারের চাবিটা তোমার কাছে রেখেছ ত ?'

'ঠাকুরের কাছেই রয়েছে।'

মায়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, 'এবার ত ভাল হয়েছি, এনে দাও, আঁচলে বাঁধি! ইস্, ঘরটা কি নোংরাই হয়েছে!'

ফলের রস নিংড়াইয়া ভবেশ তাহাকে খাওয়াইল। বলিল, 'যে ওষুধ পড়েছে, আর জ্বর আসছে না।'

'না এলেই বাঁচি! কলকাতায় এলাম, একটু বেড়াবো তার উপায় নেই! মাঠে কেমন ছোট ছোট ছেলেরা খেলা করছে ছাখো ? ইচ্ছে করে বুড়ি হয়ে ওদের মাঝখানে বসে থাকি।'

ভবেশ কহিল, 'পার্ক্‌টা সুমুখে আছে বলেই এ বাড়ীটা আমার ভাল লেগেছে, তুমি ত খোলা জায়গা ভালবাসো!'

'খোলা জায়গা ভালবাসি বলেই ত ঘরে বন্ধ আছি।' বলিয়া মায়া আবার হাসিল। তাহার কথার বেদনাটুকু অনুভব করিয়া ভবেশের ভিতরটা টন্ টন্ করিয়া উঠিল।

'ওবেলা তোমাকে আমি বেড়াতে নিয়ে যাবো মায়া, মোটরে যাবে-আসবে, পরিশ্রম হবে না।'

বাহিরে মাঠের দিকে তাকাইয়া মায়া চুপ করিয়া রহিল, এবং সেই দিকে দৃষ্টি প্রসারিত রাখিয়াই সে আস্তে আস্তে কহিল, 'রুগী বয়ে বেড়ানোই বা মানুষের কতদিন ভাল লাগে! দু' মাসের ওপর হয়ে গেল!'

'তা হোক, রোগটা স্বাভাবিক, তাতে লজ্জার কিছু নেই।'

কলিকাতার হাওয়ায় জ্বর সারিল বটে, কিন্তু শরীর সারিল না। দেহ শীর্ণতর হইয়া আসিল, কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু, নিরুৎসাহ মন। নদীর খরস্রোত যেন স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। কথার ঔজ্জ্বল্য নাই, নূতন সংসারের জীবন-চেতনা নাই,—প্রত্যেকটি দিন যেন একটি দুঃসহ ব্যথার বোঝা লইয়া এই দুইটি স্বামী-স্ত্রীর মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া পার হইয়া যায়।

মাসখানেক মাত্র, তারপর আবার ডাক্তার আসিলেন। রোগীর কাশিতে রক্তের ছিটা দেখিয়া বলিলেন, 'রক্তটা একবার পরীক্ষা হওয়া দরকার, বুঝলেন ভবেশবাবু!'

ভবেশ বুঝিতে পারিয়াছিল।

রক্ত পরীক্ষা হইল, এবং তাহার পরের দিনই ডাক্তারের পরামর্শে স্ত্রীকে লইয়া ভবেশ ভয়ার্ত্ত-ব্যাকুলতায় কলিকাতা ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

অতি নিভৃত দুইটি স্বচ্ছ জীবন-ধারা। তাহাদের ভিতরে মালিন্যও যেমন নাই, ফাঁকিও তেমনি কোথাও ছিল না। ক্ষুদ্র দুইটি হৃদয়, সে-হৃদয়ে অনন্ত সম্ভাবনার স্বপ্ন ও আশা, একটুখানি নিবিড় ভালবাসা, সে ভালবাসা বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যের রূপ —তবুও মহাকাল আপন প্রয়োজনে এই দুইটি নিরপরাধের পরে কটাক্ষ করিলেন। সৃষ্টি ও ধ্বংসলীলার রহস্যময় নিয়ম।

মাস-কয়েক পরে আবার ভবেশকে দেখা গেল! ট্রেণ চলিয়াছে, একখানা কামরার মধ্যে সে বসিয়া। মাঠের পর মাঠ পিছন দিকে ছুটিয়া চলিতেছে।

কত যাত্রী উঠিল, কত যাত্রী নামিয়া গেল। মানুষের জীবনও এমনি। পরিচয় হয়, কোলাহল ও আনাগোনা চলে, আবার পিছনের পথে অদৃশ্য হইয়া যায়। ক্ষণিকের বিদ্রূপ, স্থায়িত্বহীনতা। বিদ্রূপ, বিদ্রূপ, বুকভাঙা বিদ্রূপ! আশ্চর্য্য এই সংসার!

তেমনি করিয়া স্রোত চলিয়াছে, অনর্গল, অবিরত প্রবাহ। একজন যে জীবনের পরম ঐশ্বর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, কোথাও তাহার জন্য খেদ নাই, গ্লানি নাই। তোমার গেল তা আমার কী?

দিন ফুরাইল, সন্ধ্যা হইয়া আসিল। গাড়ী আসিয়া থামিতেই ভবেশ নামিয়া পড়িল, সঙ্গে তাহার কিছুই ছিল না। নামিল বটে, কিন্তু কোথায় যাইবে? সব চেয়ে বড় আশ্রয় তাহার ভাঙিয়া গিয়াছে, আর স্থান কোথায়? লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়, তাই ত চারিদিক বালুময় মরুভূমি! কোথায় যাইবে? অথচ অভাব তাহার কিছুই নাই! উচ্চ শিক্ষা, পিতার সম্পত্তি, হাতে প্রচুর পরমায়ু, স্বাস্থ্যবান্ শরীর—কিন্তু ইহাদের মূল্য কি? একদিন ত সব ছাই হইয়া যাইবে! বিদ্রূপ, বিদ্রূপ!

সিঁথীর সিন্দূর এখনও জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে, বড় বড় কালো

চোখ, নিরুপায় অথচ নির্ভরশীল, কী আশা সেই দুইটি চোখে, শীর্ণায়মান দেহের লজ্জা, কী মধুর লজ্জা,—এখনও তাহার পাশে পাশে অশরীরী দেহ লইয়া চলিয়াছে! দীর্ঘ পাঁচ বছর তাহার সহিত পরিচয়, সে-পরিচয় আকাশের সহিত সমুদ্রের, অবিচ্ছিন্ন, ঘন-নিবিড়, সামান্য মৃত্যু দ্বারা সে পরিচয় মোছে না।

ষ্টেশনের বাহির হইয়া সে পথে নামিল। চারিদিকে আলো, গাড়ীঘোড়ার হল্লা, যাত্রীর ভিড়, পুলিশ পাহারার শাসন। পুলের উপর দিয়া ভবেশ হাঁটিতে হাঁটিতে চলিল বাসার পথে।

এই শহর ইহার পর আর তাহার ভাল লাগিবে না তাহা সে জানে। সেই একই জীবনের পুনরাবৃত্তি। অথচ এই কোলাহল, এই আয়োজন—ইহারা শুধু ছিল সেই তাহারই জন্য! সে ছিল ইহাদের আত্মা!

বাসায় পৌঁছিয়া সে ঠাকুরকে ডাকিয়া তুলিল; তখন খানিকটা রাত হইয়াছে। ঠাকুর বেশ বিশ্বাসী লোক, বাড়ী আগ্‌লাইয়া পড়িয়া থাকে। খবরটা সে জানিত না, ভবেশকে দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। ভবেশ কহিল, 'ঘরটা আগে খুলে দাও গিরীশ।'

গিরীশ তাড়াতাড়ি গিয়া শুইবার ঘর খুলিয়া দিল। ভবেশ পুনরায় কহিল, 'আজ কিছু খাবো না, একঘটি খাবার জল রেখে তুমি শুয়ে পড়গে।'

গিরীশ কম্পিত কণ্ঠে একবার বলিতে গেল, 'কিন্তু বৌমা—'

'সে নেই গিরীশ। যাও তুমি তাড়াতাড়ি। জল এনে দরজার গোড়ায় রেখো।' বলিয়া সে দরজাটা ভেজাইয়া দিল।

সুইচ্‌ টিপিতেই আলো জ্বলিল। সেই যে ঘর বন্ধ করিয়া তাহারা চলিয়া গিয়াছিল, তারপরে এই আজ খোলা হইল। ফিরিয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি গুছাইতে পরিশ্রম হইবে মনে করিয়া তাহারা দুইজনে খানিকটা গুছাইয়া গিয়াছিল। কেবল জানালার ভিতর দিয়া কয়েকখানা চিঠি গিরীশ মেঝের উপর ফেলিয়া রাখিয়াছে। পুরানো চিঠি, তবু এক একখানি করিয়া ভবেশ পড়িয়া শেষ করিল। একখানি চিঠি মায়া লিখিয়াছিল গিরীশকে। লেখাপড়া জানে না বলিয়া গিরীশ পড়ে নাই। চিঠিতে গিরীশকে কত সাবধান করা, কত উপদেশ দেওয়া। কলিকাতা শহর, যেন চুরি হয় না; ঝড়-বৃষ্টি আসিলে যেন সময় মত জানালা-দরজা বন্ধ করা হয়। বাড়ীতে যেন মাঝে মাঝে ঝাঁট পড়ে, সন্ধ্যা দেওয়া হয় ইত্যাদি।

সুশৃঙ্খল জীবন, স্বচ্ছন্দ সংসার, নির্ম্মল প্রেম—অথচ বিধাতার কী প্রয়োজন সিদ্ধ হইল ইহাদের নির্ম্মমভাবে চূর্ণ করিয়া দিয়া? সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে একটি অকরুণ নিষ্ঠুরতা ভবেশের চোখে পড়িল। এই দয়াহীন বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে একমাত্র সান্ত্বনা যে, ঈশ্বর বলিয়া কোন আজগুবি বস্তু নাই। ঘরের মধ্যে ভবেশ পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ভবিষ্যতের দিকে যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে কোথাও তাহার আত্মার আশ্রয় নাই, তাহার গতিই শুধু আছে, স্থিতি নাই। তাহার ব্যথা ব্যর্থ প্রেমের নয়, বিচ্ছেদের নয়, হতাশারও নয়—তাহার ব্যথা মৃত্যুর! এত বড় মৃত্যু তাহার জীবনে আর ঘটে নাই, এ মৃত্যু তাহাকে একেবারে নিঃস্ব করিয়া দিয়া গেল। ইহার পরে বাঁচিয়া থাকার আর কোন অর্থই হয় না।

ঘরে থাকিতে তাহার ভাল লাগিল না, মনে হইল চারিটা দেয়াল চারিদিক হইতে অগ্রসর হইয়া তাহাকে কণ্ঠরোধ করিয়া হত্যা করিবে। অন্ধকারে বাহির হইয়া সিঁড়ি বাহিয়া আবার সে নীচে নামিয়া বাহির হইল। সদর দরজার কাছে একটি পাশে গিরীশ যে নীরবে বসিয়া ছিল, তাহা সে লক্ষ্যই করিল না। রাস্তায় পড়িয়া সে নিঃশ্বাস লইল। হউক মৃত্যুর হাওয়ায় এ পৃথিবীর নিঃশ্বাস কলুষিত, তথাপি সে স্বস্তি পাইল। ঘর তাহার ভাঙিয়াছে, এবার পথেই বাসা, পথেই তাহার প্রত্যহের প্রয়োজন।

রাস্তার ধারেই একখানা বাড়ীতে কীর্ত্তন-গান হইতেছিল। কিছুক্ষণ সে দাঁড়াইল, তারপর আর ভাল লাগিল না, আবার সে চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে একটা বাগানের ভিতর ঢুকিয়া সে ঘাসের উপর বসিয়া পড়িল।

কয়েকদিন সে এমনি করিয়াই কাটাইল।

একদিন এক বাল্যবন্ধুর সহিত তাহার দেখা হইয়া

গেল। নাম তাহার যোগীন। বোষ্টমের ছেলে। ছোটবেলা হইতেই গলায় সে কণ্ঠী পরিত, ইহার কণ্ঠী টানিয়া ছিঁড়িয়া দিয়া বন্ধুরা কতবারই তাহার সহিত ঝগড়া বাধাইয়াছে। আজ ইহার গলায় কণ্ঠী নাই বটে, কিন্তু পরণে গেরুয়া উঠিয়াছে। ছেলেটা ঝগড়া করিত বটে, কিন্তু সে কলহ মনে মনে পুষিয়া রাখিত না। যোগীন নাম ছাড়িয়া সে এখন যোগানন্দ নাম লইয়াছে।

'আয়।' বলিয়া ভবেশকে সঙ্গে লইয়া সে বরাবর গঙ্গার ধারে আসিয়া এক জায়গায় বসিল। বলিল, 'বৌ মরেছে তা হয়েছে কি?' বলিয়া সে একটা থলির ভিতর হইতে দেশালাই বাহির করিয়া ভবেশের হাতে দিয়া পুনরায় কহিল, 'জ্বাল্ ত দেখি? দাঁড়া, আগে—'

ছোট একটা কল্‌কে সাজিয়া সে নিজের মুখে ধরিল। বলিল, 'সাপিটা শুকিয়ে গেছে, তা হোক্, জ্বাল্।'

দেশালাইয়ের আগুনে কল্‌কে টানিয়া সে একমুখ ধোঁয়া উদ্গিরণ করিয়া ভবেশের হাতে দিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'টান্ ভাল করে।'

'ওসব আমি ছুঁইনে. যোগীন।'

অবাক্ হইয়া যোগীন বলিল, 'সে কি রে? নেশাই যদি না করলি ত বাঁচ্‌বি কি নিয়ে?'

'যারা বাঁচতে জানে তারা নেশা করে না। তুমি খাও।'

কল্‌কে টানিতে টানিতে যোগানন্দ কহিল, 'বল্ এইবার।'

'বল্‌ব কি যোগীন, বলবার আমার কিছু নেই, আমার সব চুরমার হয়ে গেছে।'

যোগীন হাসিল, সে-হাসি যেন পৃথিবীর সমস্ত কিছুকে একটি মুহূর্ত্তেই তুচ্ছ করিয়া দিল। বলিল, 'কিছুই হয়নি তোর। স্ত্রী-বিয়োগ ঘটেছে, এই ত? অত্যন্ত সামান্য কথা। কারো স্ত্রী মরে, কারো স্ত্রী বিধবা হয়। মাঝখানে খানিকটা সোরগোল হয়ে গেল, তুই যে একা সেই একা।'

'তুমি জান না যোগীন, তুমি জান না, সে আমার কতখানি—'

'জানি।' বলিয়া যোগীন কল্‌কেয় আর একটা টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িল। বলিল,—'প্রণয়িনী মলে বেদনা বোধ, আর স্ত্রী মলে অভাব বোধ, জানি সব। কালের প্রবাহে ও দুটোই ভেসে যায়।'

ভবেশ কহিল, 'তোমার হ'লে তুমি বুঝতে যোগীন।'

যোগীন আবার হাসিল।

বহুক্ষণ ধরিয়া দুইজনে কথাবার্ত্তা কহিবার পর, যোগীন কহিল, 'চল্ উঠি।'

গা ঝাড়া দিয়া ভবেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, 'কোন্ দিকে যাবে?'

'চল্, হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে যাওয়া যাক্। আমি থাকি দর্জ্জি-পাড়ায়, তুই?'

'বাদুড়বাগানে।'

'তবে ত ওই রাস্তা দিয়েই যেতে হবে।' বলিয়া সে অগ্রসর হইয়া চলিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, পথে পথে জ্বলিয়াছে আলো, গাড়ী ঘোড়া ট্রাম চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছিল। কিছুদূর আসিয়া যোগীন কহিল, 'কাছে পয়সা-কড়ি আছে রে?'

'আছে, কি হবে?'

ততক্ষণে যোগীন একটা খাবারের দোকানের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বলিল, 'আনা-দুয়েকের খাবার কিনে নিয়ে যাই।'

খাবার কেনা হইল, এবং সে খাবারের ঠোঙা ভবেশের হাতেই রহিল, নিজের হাতে লইবার আগ্রহ যোগীনের দেখা গেল না।

'তুমি কি এখন দর্জ্জিপাড়াতেই আছো? আগে কোথায় ছিলে?'

যোগীন কহিল, 'আগে ছিলাম সিকদারবাগানে, তখন ত ইস্কুল-কলেজে পড়ি, মাঝখানের জীবনটা আমার কাছেও অন্ধকার, তারপরে এই বছর-খানেক হলো কলকাতায়—কলকাতা আমার একটুও ভাল লাগে না।'

কেন ভাল লাগে না তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবার প্রয়োজন ছিল না, সম্ভবতঃ ইহার এই গেরুয়া ধুতি-চাদরের সহিত কোনো উত্তেজনাময় শহরের ছন্দ মিলে না,—ভবেশ নীরবে তাহার পাশে পাশে চলিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ চলিবার পর একটা সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে ঢুকিয়া যোগীন তাহাকে অনুসরণ করিতে বলিল। গলিটা ঘোর অন্ধকার, কেবল বহুদূর হইতে একটা গ্যাসের আলো স্তিমিত হইয়া ভিতরে খানিকটা প্রবেশ করিতে পারিয়াছে মাত্র। মনে হইল গলিটার একটা দিক চাপা, ভিতরে একবার ঢুকিলে সুমুখ দিয়া বাহির হইবার আর পথ নাই এবং সেইজন্যই বোধ করি অকারণে গ্যাসের আলো দিবার প্রয়োজন ছিল না।

'ঠোঙাটা হাতে নাও যোগীন, এবার আমি যাই।'

যোগীন মুখ ফিরাইয়া কহিল, 'এত কাছাকাছি এসে ফিরে যাবি, সন্নিসি বন্ধুর আস্তানাটা না হয় একবার দেখেই যা?'

'এখানে সন্নিসির আস্তানা মানায় না!'

'সন্নিসি হলেই মানায়, নৈলে নয়।' বলিয়া যোগীন একটু হাসিয়া পুনরায় কহিল, 'এই আমার বাসা, সোজা ভিতরে চলে' আয়, হোঁচট খাসনে যেন অন্ধকারে,—দেখিস মাথাটা বাঁচিয়ে, দরজাগুলো বড় ছোট ছোট।'

বাড়ীটা প্রাচীন পদ্ধতিতে তৈরী, সুমুখের দিকটা ভগ্নাবশেষ, মনুষ্য-বাসের অযোগ্য, বিনা ভাড়ায় ছাড়িয়া দিলেও কোনো কেরাণি-পরিবার থাকিতে চাহিবে না; যেমনি ঠাণ্ডা তেমনি অস্বাস্থ্যকর, পুরানো ইট-কাঠের একটা অবরুদ্ধ গন্ধ, হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া ভবেশ চলিতে লাগিল।

কিছুদূর গিয়া একটা ছোট উঠান্ মিলিল, মনে হইল

বাতাসটা হাল্‌কা হইয়া আসিয়াছে। একদিকে ইঙ্গিত করিয়া যোগীন কহিল, 'এই আমার ঘর, আয় ভবেশ।'

অন্ধকারেই দুইজনে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল, এবং সে শুধু কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র, তারপর হঠাৎ ভৌতিক ঘটনার মত ফস্ করিয়া ঘরের একান্তে কে যেন আলো জ্বালিল। আর একটু হইলেই ভবেশ প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিত, কিন্তু চীৎকার সে করিল না, দেখিতে দেখিতে এই ঠাণ্ডাতেও সর্ব্বাঙ্গ তাহার ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল।

আলো যে জ্বালিল তাহার দিকে তাকাইয়া হাসিয়া যোগীন কহিল, 'দু'দিন বাড়ী ঢুকিনি, রাগ করেছিস, হ্যাঁ রে?'

মেয়েটি চুপ করিয়া আলোর দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিল, এতটুকুও সাড়া দিল না।

'উপোস করে আছিস্ নিশ্চয়ই, কেমন? এই ঢাখ্, তোর জন্যে কতদূর থেকে খাবার কিনে এনেছে আমার বন্ধু!'

তবুও সাড়া দিল না দেখিয়া যোগীন ভবেশের দিকে তাকাইয়া হাসিল, বলিল, 'তুই ওর মান ভাঙাতে পারিস ভবেশ?'

ভবেশ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। স্ত্রী ছাড়া জীবনে অপরিচিতা কোনো নারীর এত কাছাকাছি সে কখনও আসে নাই, গলার আওয়াজ তাহার বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। ঠোঙাটা আস্তে আস্তে নামাইয়া রাখিয়া অতি কষ্টে শুধু কহিল, 'এবার আমি যাই যোগীন, আর একদিন বরং—'

'থেকে যা না আজকের রাতটা এখানে?' তারপর একটু

থামিয়া সে পুনরায় কহিল, 'রাগ ও করেনি, বড় লক্ষ্মী মেয়ে, আমার কাছে এসো ত চিন্ময়ী ?'

চিন্ময়ী আস্তে আস্তে উঠিয়া তাহার পাশে আসিয়া বসিল। যোগীন তাহার গলার উপর হাতটা রাখিয়া হাসিয়া বলিল 'চিন্ময়ী, বলে' দে ত ভাই, তুই আমার স্ত্রীও নয়, রক্ষিতাও নয় ?'

চিন্ময়ী তাহার হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ধীরে ধীরে কহিল, 'ওঁকে আলো ধরে বাইরে দিয়ে এসো।'

'সে কি রে পাগলি,—উনি যে তোর অতিথি, দেখতে এলেন এতটা রাস্তা হেঁটে, এমনি করে তাড়াবি ? খাবার এনেছে, যত্ন করে কিছু খাইয়ে দে, মিষ্টি করে কথা বল্ ? মনে করবে কী ? এই হয়েছে তোকে নিয়ে বিপদ ! ভাল যাকে লাগবে তুই তার গায়ের পোকা, আর ভাল যাকে লাগবে না,—ওকি, ওঁর দিকে তুই মুখও ফেরাবিনে ?'

চিন্ময়ী এবার ভবেশের দিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিল, বলিল, 'রাত হয়েছে, আপনি বাড়ী যাবেন না ?'

'দেখছিস ত, কেমন বড়লোক আমার বন্ধু ? বড় ভাল ছেলে, ভবেশ ওঁর নাম।'

ভবেশ আর কোনোদিকে তাকাইল না, অসম্মানিত মুখে গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'রাস্তাটা আমায় দেখিয়ে দাও যোগীন।'

'আর একটু বসবিনে রে ? এর কথায় কিছু মনে করিসনে ভবেশ, এ মেয়ে এমনিই। যেমনি অসামাজিক, তেমনি

অভদ্র।' বলিয়া হাসিয়া চিন্ময়ীর একরাশ চুলের গোছা ধরিয়া একটু নাড়িয়া দিল।

ভবেশ বসিল না, কিন্তু দাঁড়াইয়া রহিল। শুধু তাহার বিস্ময়-বিস্ফারিত দুইটা চক্ষু ক্ষণে ক্ষণে গ্লানিতে আবিল হইয়া উঠিতেছিল। এত বড় দুর্নীতির মুখোমুখি জীবনে সে দাঁড়ায় নাই। কী কুক্ষণে এই ছদ্মবেশী ভণ্ড তপস্বী যোগীনের সহিত তাহার দেখা হইয়া গিয়াছে, এই ভয়াবহ কুৎসিত দৃশ্যটা এমন করিয়া চোখ মেলিয়া দেখিতে হইল! অথচ এই যোগীন এমন ছিল না, ইহার উদারতার উদাহরণ এখনও কিছু কিছু তাহার মনে পড়ে। মানুষের নিঃস্বার্থ উপকার করিয়া বেড়াইত বলিয়া বন্ধুসমাজে ইহার প্রতি বিদ্রূপের আর অন্ত ছিল না! সেই যোগীনের এই শোচনীয় অধঃপতন!

'এসো যোগীন, আর আমার সময় নেই!' বলিয়া সে দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

আলোটা হাতে লইয়া যোগীন তাহাকে পথ দেখাইয়া বাহিরের দরজার কাছে আনিল। বলিল, 'এই যেন শেষ না হয় ভবেশ, ঠিকানাটা বল্, আমিই না হয় গিয়ে তোর সঙ্গে দেখা করব।'

দেখা আর কোনোদিন না হয় ইহাই ছিল ভবেশের আন্তরিক ইচ্ছা। বলিল, 'ঠিকানা দিতে পারি, কিন্তু আমি যে শীগগিরই বাইরে চলে যাচ্ছি।'

'কবে যাবি?'

'দু'-একদিনের মধ্যেই। .তাছাড়া ও-বাড়ীটা বদ্‌লাবারও ইচ্ছে রয়েছে।

'তবু বল্‌, ঠিকানাটা থাকুক আমার কাছে।'

মিথ্যা কথা বলা ভবেশের অভ্যাস নাই, ঠিকানাটা বলিয়া আর সে দাঁড়াইল না, হন্‌ হন্‌ করিয়া গলি দিয়া চলিতে লাগিল। যোগীন একটু হাসিল মাত্র।

দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাইবার পর আলোটা লইয়া যোগীন ভিতরে ঢুকিবে, হঠাৎ তাহার চাদরে একটু টান্‌ পড়িল। ফিরিয়া দেখে, তাহার সহিত চিন্ময়ীও কখন পিছনে পিছনে আসিয়া তাহার চাদরের খুঁট্‌ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

'কী মেয়ে তুই রে, এর মধ্যে এসেছিস সঙ্গে সঙ্গে?'

'তোমাকে বিশ্বাস নেই, আসছি বলে হয়ত চলে যাবে!'

'বেঁধে রাখতে পারবি মুখপুড়ি?'

দাঁতের উপর ঠোট চাপিয়া চিন্ময়ী খানিকটা হাসিল, তারপর ভিতর মহলের নির্জ্জন নিঃশব্দ অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া কহিল, 'বড্ড ভয় করে এখানে, ঘরে চল।'

দিন-তিনেক পরে বাদুড়বাগানের বাড়ীতে এক সময় আসিয়া যোগানন্দ ভবেশকে গ্রেপ্তার করিল। সটান্ আসিল উপরের ঘরে, ভিতরে ঢুকিয়া পিছনদিক হইতে বলিল, 'কি ভাগ্যি যে, মহাপুরুষের দেখা পেলাম!'

অনিচ্ছাকৃত অভ্যর্থনা করিয়া ভবেশ কহিল, 'বসো।'

'কাল আমি এসেছিলাম দু'বার, এমনিই এসেছিলাম, দেখা না পেয়ে ভাবলাম আমিই একমাত্র ভবঘুরে নয়।'

ভবেশ বলিল, 'কী অভিসন্ধিতে আসা, শুনি?'

'অভিসন্ধি কিছু না, একদম নিঃস্বার্থ!'

'নিঃস্বার্থ? এ ত' সন্ন্যাসীর মত কথা হল না?'

দুইজনেই হাসিল।

'বাস্তবিক'—যোগীন কহিল, 'নিজের দিকে তাকালে আমার হাসিই পায়। একজন বন্ধু পেলেই হলো, অন্ধ হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘুরতে থাকি, যতদিন না সে বিরক্ত হয়ে আমাকে ছেড়ে যায়। এই আমার স্বভাব।'

ভবেশ কহিল, 'তোমার এ রকম সন্ন্যাসের শেষ লক্ষ্য কী!'

'কিছু না, সকলেরই একটা যা হোক লক্ষ্য থাকে, থাকে না শুধু সন্ন্যাসীর। তা ছাড়া আমি ত সন্ন্যাসী নয়!'

'তবে যে গেরুয়া—?'

'ওটা গেরুয়াই, সন্ন্যাস নয়।'

'তবে কী তুমি, বল?'

যোগীন এবার নির্ম্মল হাসি হাসিল। বলিল, 'সেটা জানলেই ত খুসি হয়ে ঘরে ফিরে যেতাম!'

এই লোকটা সেদিন তাহার মনে যে বিভীষিকার সঞ্চার করিয়াছিল, সেই দৃশ্যটা আর একবার স্মরণ করিয়া ভবেশ ত্রস্ত হইয়া উঠিল। মনে হইল সর্ব্বাঙ্গে কুৎসিত কাদা লেপিয়া এই ছন্নছাড়া যুবকটি পথে-ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ায়। এমনি চরিত্রের কথা সে উপন্যাস-সাহিত্যে পড়িয়াছে, কিন্তু সে অলীক উপন্যাস, ইহাদের জীবনের সত্যকে চাপিয়া মিথ্যাকে লইয়াই সে উপন্যাসের যত আড়ম্বর।

'তোমার চলে কী করে যোগীন?'

'চলে না।' বলিয়া যোগীন আবার হাসিল, 'আগে ছিলাম একটা, এখন হয়েছি দুটো।'

'ভূতের বোঝা ঘাড়ে না নিলেই পারতে?' বলিয়া ভবেশ জানালার বাহিরে মুখ ফিরাইল।

'ঘাড়ে ত নিইনি ভাই, জুটে গেল! নিজেই এসেছে, নিজেই হয়ত' আবার একদিন চলে যাবে, সেই আশায় আছি।'

ভবেশ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইল।

যোগীন বলিতে লাগিল, 'হ্যাঁ, ও মেয়েটা আমার মালদহর আমদানী। সে অনেক ইতিহাস, ছুঁড়ী অনেক পীড়ন সয়েছে। এই ত বছর-দেড়েক হলো আছে আমার সঙ্গে—'

ভবেশের কান দুইটা গরম হইয়া উঠিল।

'কোনোদিন খায়, কোনোদিন খেতে পায় না, মরা জন্তুর মত

রাতে আমার কাছে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। যেদিন ঘরে ফিরিনে সেদিনও অমনি করে ঘুমোয়! কাপড় না থাকলে আমার গেরুয়া চাদরখানাই জড়িয়ে থাকে! এই করেই এতদিন কাটল নানা জায়গায়, নানা বাসায়। দেড় বছরের মধ্যে আমি জানতেই পারিনি ও কুমারী, সধবা না বিধবা।'

অত্যন্ত নির্লিপ্ত অবহেলায় কথা-কয়টা সে বলিয়া গেল, এতখানি তাচ্ছিল্য ও ঔদাসীন্য তাহার কথায় ফুটিয়া উঠিল যে, ভবেশ বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে না তাকাইয়া পারিল না।

'একবার জিজ্ঞেসাও করনি ?'

'না, তার দরকার ছিল না। ভেবেছিলাম ও নিজেই বল্‌বে, কিন্তু তা বলেনি, ওদিকটা ওর গ্রাহ্যেই আসে না।'

'অদ্ভুত মেয়ে ত দেখছি ?'

'অথচ এই দীর্ঘদিন ধরে' কী লাঞ্ছনাটাই আমার হলো ভবেশ! যেখানেই ও যায় আমার সঙ্গে, সেইখানেই আমার অপমান, নিন্দা আর বিদ্রূপ। স্ত্রী নয়, এমন মেয়ে সঙ্গে থাকলে কী বীভৎস আন্দোলন ওঠে জানো ? পথে-পথে পদে-পদে তার পীড়ন, যেন দুনিয়াশুদ্ধ সবাই সাধু আর সচ্চরিত্র!'

ভবেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'এ আলোচনা থাক্ যোগীন, এসব আমি বুঝতে পারিনে। পৃথিবীর অনেক ঘটনার সঙ্গেই আমার অতি অল্প পরিচয়।'

যোগীন একটুখানি ম্লান হাসি হাসিল, বলিল, ‘পরিচয় অল্প থাকাই ভাল ভাই। বিচিত্র অভিজ্ঞতায় মানুষ আনন্দ পায় জানি, জীবনটা রূপবান্ হ'য়ে ওঠে তাও মানি, কিন্তু তার দাম দিতে হয় অনেক। অনেক দুঃখ, অনেক ব্যথা, অনেক লজ্জা।’

একটা কথা ভবেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে না-ই ভাবিয়াছিল, কিন্তু এখন আর থাকিতেও পারিল না, বলিয়া ফেলিল, ‘সবই না হয় বুঝলাম, কিন্তু ওর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি?’

‘কিছুই না!’

‘কিছুই না?’

‘না, কিছুই না। যতক্ষণ আছে ততক্ষণই, যখন চলে যাবে তখন একটিবারও বল্‌ব না, কোথায় চল্‌লে! আর কি জানো, ও গেলেই বাঁচি, অন্যের জন্যে ভাত আর কাপড় সংগ্রহ করে আনা···এর চেয়ে আমি জেল্ খাট্‌তে রাজি আছি। কেউ যদি চিন্ময়ীকে নিয়ে যায় ত···বাস্তবিক কত চেষ্টা করেছি—’

‘থাক্ ভাই, ও আমি আর শুনতে চাই না। তোমরা যা কর এর চেয়ে মেয়েদের পক্ষে অপমান আর কী হতে পারে?’ একটুখানি উত্তেজিত হইয়া ভবেশ পুনরায় কহিল, ‘স্ত্রীলোক নিয়ে দুর্নীতি আর দায়িত্বহীনতা······অথচ জানো, স্ত্রীলোকই হচ্ছে যুগ-যুগান্তের সভ্যতার জন্মদাত্রী? যত আবিষ্কার, যত কলা-কৃষ্টি, যত দর্শন ও সাহিত্য, তার মূলে নারী, নারী থেকেই পৃথিবীর সর্ব্বোত্তম মানুষের উৎপত্তি?’

'এর আবার উল্টো দিকটাও আছে।' বলিয়া যোগীন হাসিল।

ভবেশের উত্তেজনাটা থামিয়া গেল গিরীশকে ঢুকিতে দেখিয়া। দুই থালা জলখাবার ও দুই পেয়ালা চা আনিয়া সে টেবিলের উপর রাখিয়া গেল।

চা দেখিয়া খুসি হইয়া যোগীন এক পেয়ালা হাতে তুলিয়া লইল। একটা থালা হাতে তুলিয়া লইয়া ভবেশ কহিল, 'ওকি, আগে খাও কিছু?'

'খাবো।' বলিয়া থালাটার দিকে একবার তাকাইয়া যোগীন কহিল, 'তুমি যে কোথায় বিদেশে যাবে বলেছিলে?'

'হ্যাঁ, যাবো দু-একদিনের মধ্যেই। এখন ঘুরবো কিছুকাল।'

'শুধুই ঘুরবে?'

'তীর্থের নাম নিয়ে বেরুবো, কিন্তু সেটা উপলক্ষ্য, ভ্রমণই হবে আসল কথা।'

আম্‌তা আম্‌তা করিয়া যোগীন বলিল, 'ওটা ভাই আমারও সাধ, চল না তোমার সঙ্গে যাই? তোমার রান্না, বাসন মাজা …তুমি একটা মানুষ…'

এতখানি বিনয় করিয়া যে কথা বলে, তাহার অনুরোধ এড়ানো কঠিন। ভবেশ বলিল, 'তুমি যখন কিছুই বিশ্বাস কর না, তখন তীর্থের ওপরেই বা লোভ কেন?'

যোগীন দমিল না, কহিল, "দেব-মন্দিরটা সামান্যই, তীর্থের পথটাই হলো তীর্থ, যাত্রাটাই তপস্যা,—কবে যাবে বল ত ভাই?'

'পরশু।'

'তবে ঝোলাঝুলি বাঁধি, কেমন ?'

ভবেশ কহিল, 'বলছ যখন এত করে',—কিন্তু ওই মেয়েটির কি উপায় করে' যাবে ?'

'করব যা হোক কিছু একটা ব্যবস্থা, ওর জন্যে ভাবিনে। কিছুই না পারি, খাবার আনতে যাচ্ছি বলে সরে' পড়বো ! দিন দু-তিন উপোস ক'রে ঘরে পড়ে থাক্‌বে, চার দিনের দিন তুমি দেখে নিও, পথে বেরিয়ে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করবে। আমাদের চেয়ে মেয়েদের বিষয়-বুদ্ধি ঢের বেশী।'

ভবেশ স্তম্ভিত হইয়া তাহার দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া রহিল, তারপর কহিল, 'সত্যি বল্‌ছ, এ তুমি পারো ?'

যোগীন তাহার বিস্ময় দেখিয়া, হাসিয়া অস্থির হইল। বলিল, 'এ কাজ ত সবাই পারে, সবাই যা পারে না তাও আমি পারি !'

তা বটে, ইহাকে অবিশ্বাস করিবার কোনো হেতু নাই !

'প্রথমে কোথায় যাবে ভবেশ ?'

ভবেশ বলিল, 'কাল আর একবার এসো, পাকা কথা হবে। তবে আমি ভাবছি, প্রথমেই যাবো দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে। এখান থেকে পাঁচ ছ'দিনের রেল-রাস্তা, পথে ভাঙতে ভাঙতে যাওয়া যাবে !'

উঠিবার সময় থালার খাবারগুলি একত্র করিয়া যোগীন চাদরের খুঁটে বাঁধিয়া লইতে লাগিল, কেন সে খাইল না,

কেনই বা সে বাঁধিতেছে তাহার অর্থ এতই সুস্পষ্ট যে, ভবেশ প্রথমে কথা কহিল না, পরে বলিল, 'নিজে তুমি খেলেই পারতে, গিরীশ না হয় আরো কিছু এনে দিত ?'

'না, এতেই হবে, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। খেতে না পেয়ে পেয়ে আহার সম্বন্ধে আমাদের সংযম এসেছে। কাল সকালে তা হলে আসছি, আজ উঠি।' বলিয়া সে বাহির হইয়া আসিল।

রাস্তায় বাহির হইয়া পথ দিয়া সে চলিতে লাগিল, জানালা দিয়া ভবেশ তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। বাল্যকালে ইহার সহিত একত্র সে লেখাপড়া শিখিয়াছে, খেলা-ধূলা করিয়াছে, সেদিন ইহার চরিত্রটা ছিল সুস্পষ্ট কিন্তু আজ মনে হইল এ লোকটা সে নয়, সংসারের আবর্ত্তে ভাঙিয়া ভাঙিয়া আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ও খানিকটা ইহার বোঝা যায়, খানিকটা দুর্বোধ্য ; খানিকটা কৃত্রিম ভঙ্গী, খানিকটা আন্তরিকতা ; একদিকে প্রচুর দৈন্য, অন্যদিকে ঐশ্বর্য্য ; অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতে মনুষ্যপদবাচ্য হইয়া উঠে নাই, অথচ মনুষ্যত্বের ছায়ায় ছায়ায় পথ হাঁটে।

দেখিতে দেখিতে পার্কের উত্তরদিকে বহুদূর পথের বাঁকে যোগীন অদৃশ্য হইয়া গেল।

তিন দিনের দিন সকাল হইতেই যাত্রার আয়োজনে ভবেশ ব্যস্ত হইয়া ঘোরাঘুরি করিতেছিল। বেলা আন্দাজ বারোটার সময় বাসায় ফিরিয়া আহারাদি করিয়া সে আবার বাহির

হইল এবং ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া সে আবার যখন ফিরিল তখন তিনটা বাজে। সন্ধ্যা ছয়টায় ট্রেণ।

আহারাদির [illegible] নীচের ঘরে শুইয়া [illegible] গিরীশের
[illegible] সিয়াছিল, নীচে হইতে উপরে সটান্ উঠিয়া ঘরের
[illegible] আসিয়াই ভবেশ হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল এবং
[illegible] সে সোরগোল করিয়া ডাকিল, 'গিরীশ, ও গিরীশ,
[illegible] এমনি করে তোমার ঘুম ? এদিকে এসো একবার।'
[illegible] ড়মড় করিয়া উঠিয়া তাহার কাছে আসিল।
[illegible] 'ঘরে কে ?'

গিরীশ কহিল, 'সেই কথাই বল্‌ছি আপনাকে দাদাবাবু। ও মেয়ে-মানুষটী এসেছেন বিদেশ থেকে আপনার খোঁজে। আপনি বেরুবার পরই ......বলি দেখি ত কে বাইরের কড়া নাড়ে...গিয়ে দেখি এক ভৈরবী।'

'যাও, ডেকে নিয়ে এসো এখানে—'

গিরীশ গিয়া ঘরে ঢুকিল, এবং তাহার পরেই আবার বাইরে মুখ বাড়াইয়া কহিল, 'ঘুমুচ্ছেন দাদাবাবু।'

'ঘুমুচ্ছে ? ডাক—'

অনেক ডাকাডাকি করিয়া তবে গিরীশ তাহাকে তুলিল। বলিল, 'দাদাবাবু এসেছেন, ডাকছেন আপনাকে।'

চোখ মুছিতে মুছিতে মেয়েটি কহিল, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, একলা থাক্‌লেই ঘুম পায়......বদ্ অভ্যেস। কোথায় তিনি ?'

'বাইরে আসুন।'

বাহিরে তাহাকে আনিয়া দিয়া গিরীশ বুদ্ধিমানের মত চলিয়া যাইতেছিল, ভবেশ কহিল, 'দাঁড়াও গিরীশ।'

মেয়েটি তাহাকে দেখিয়া কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া প্রণাম করিল। বলিল, 'কোথায় গিয়েছিলেন? বেশ বাড়ীটা আপনার······আলো হাওয়া······কোথাও বসলেই ঘুম পায়।'

গিরীশের মুখের দিকে নির্ব্বাক কৌতূহলময় দৃষ্টিতে ভবেশ তাকাইতেই স্বচ্ছ হাসিয়া তরুণী ভৈরবীটি কহিল, 'চিন্‌তে পারছেন না, ভুলে গেলেন এর মধ্যে? বাবা, পুরুষ মানুষের কী মন!'

'আসছি দাদাবাবু বাইরে যেন কে—' বলিয়া গিরীশ হন্ হন্ করিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

'এত খুজে খুঁজে আপনার এখানে এলাম আর আপনি চিন্‌তে পারছেন না?'

যতখানি বিস্ময় ততখানিই রহস্য। কিন্তু ভবেশ উত্ত্যক্ত হইয়া কহিল, 'কেমন করে চিন্‌ব, দেখিনি যে কোনোদিন।'

'ওমা, কি মিথ্যুক, দেখেননি? খাবার কিনে খাইয়ে এলেন, এখন সব অস্বীকার?' বলিয়া চিন্ময়ী আবার হাসিয়া উঠিল।

এতক্ষণে আশ্বস্ত হইয়া ভবেশ দালানের জানালার কাছে সরিয়া গেল। বলিল, 'চিন্‌তে সত্যিই পারিনি, সেদিন অন্ধকারে দেখেছিলাম।'

'আমিও ত ছিলাম অন্ধকারে?'

ভবেশ সে কথার আর জবাব দিল না। বলিল, 'যোগীন কোথায়, ঠিক সময় ষ্টেশনে যাবে ত?'

'যাবেন।' বলিয়া চিন্ময়ী একটু থামিল, তারপর পুনরায় কহিল, 'আপনারা যাচ্ছেন আমার কি উপায় করে গেলেন?'

'যোগীন কি ব্যবস্থা করেছে তা ত জানিনে?'

'আমি জানি, তিনি আমায় পথে বসিয়ে যাবেন। কিন্তু আমি তাঁকে ছেড়ে থাক্‌ব কেমন করে?'

অত্যন্ত সহজ সরল স্বীকারোক্তি, অতিরিক্ত নির্ভীক। ভবেশ একটু থতমত খাইয়া বলিল, 'সে আলোচনা তার সঙ্গে, আমার কাছে ত নয়!'

'আপনারই কাছে।' চিন্ময়ী কহিল, 'আপনি ত আর দাঁড়িয়ে আমার দুর্দ্দশা দেখতে পারবেন না? আমিও যাবো ওঁর সঙ্গে।'

আসল কথাটাই এই। ভবেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর একসময় স্পষ্টই বলিল, 'মেয়েছেলে সঙ্গে নিয়ে আমার ভারি অসুবিধে হবে। ও আমার অভ্যেস নেই।'

চিন্ময়ী কহিল, 'সঙ্গেও নিচ্ছেন না, ঝঞ্ঝাটও আপনার নেই, দায়িত্বের মধ্যে শুধু খরচের দায়িত্বটা আপনি নেবেন। আর তা ছাড়া মেয়েছেলে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া আপনার অভ্যেস নেই, কিন্তু বাইরের লোকের সঙ্গে যাতায়াতটা আমার অভ্যেস আছে। তাদের আমি স্বচ্ছন্দে রাখতেও পারি, সহজে তাড়াতেও পারি। আমি যাবোই আপনার সঙ্গে।'

'এত পথের কষ্ট সহ্য করে—'

'পথের কষ্ট আপনারই, আমার নয়। যদি পারি ত বরং—' একটু হাসিয়া চিন্ময়ী কহিল, 'আপনার কষ্ট একটু লাঘবও করে দেবো।'

কথাটা শুনিয়া ভবেশের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। স্ত্রীলোকের মুখ হইতে এ ধরণের কথা সে কোনোদিন শুনে নাই। আধুনিক কালের নারী সমাজের এই মেয়ে যদি উদাহরণ হয় তবে জাতির শোচনীয় নৈতিক অধঃপতনের আর কত দেরি?

আস্তে আস্তে সে ঘরে গিয়া ঢুকিল! ঘরে ঢুকিয়াও নিস্তার নাই, পিছনে পিছনে চিন্ময়ীও ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে ভবেশ তখনই আবার বাহির হইয়া যাইতেছিল, চিন্ময়ী ছাড়িবার পাত্রী নয়, বলিল, 'আপনি ত স্ত্রী নিয়ে ঘর করতেন, শাড়ী কাপড় একখানা আছে?'

'শাড়ী? দেখি—' বলিয়া ভবেশ একটা তোরঙ্গ টানিয়া খুলিতে বসিল।

চিন্ময়ী কহিল, 'এতক্ষণ মুখ তুলেও একবার আপনি আমার দিকে তাকাননি, তাহলে দেখতেন আমি একখানা গেরুয়া থান্ জড়িয়ে বেরিয়ে এসেছি।'

শাড়ী কাপড় একখানা কোন রকমে টানিয়া বাহির করিয়া দিয়া ভবেশ দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। পিছন দিক্ হইতে

তাহার সেই দ্রুতগতির দিকে তাকাইয়া নিঃশব্দে চিন্ময়ী একটুখানি হাসিয়া লইল মাত্র।

যথা সময়ে ষ্টেশনে পৌঁছিয়া যোগীনের দেখা মিলিল। তিনখানা টিকেটই তখন করা হইয়াছে।

চিন্ময়ী গিয়া অতি আনন্দে যোগীনের হাত ধরিল। যোগীন সেই প্ল্যাট্‌ফরমে অত লোকের সম্মুখেই তাহার চিবুকটি নাড়িয়া দিয়া কহিল, 'কি গো লক্ষ্মী,—বাঃ এ যে একেবারে রাজরাণীর বেশ!'

'উনি দিলেন, তোমার বন্ধু।'

'তা ত দেবেই, সুন্দরী মেয়েরা আজো পৃথিবী শাসন কচ্ছে যে!' বলিয়া যোগীন একবার হাসিয়া উঠিল।

এই জনতার মাঝখানে দাঁড়াইয়া এমন করিয়া স্ত্রীলোককে আদর করিতে দেখিয়া ভবেশ মনে মনে চটিয়া গিয়াছিল। সমস্ত পথই বুঝি বা ইহারা এমনি করিয়া জ্বালাইতে জ্বালাইতে যাইবে! বাস্তবিক মায়ার মত মেয়ে পৃথিবীতে আর সে দ্বিতীয়টি দেখিল না! স্ত্রীর কথা মনে হইতেই একটি মুহূর্ত্তে তাহার চোখ দুইটা বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল, সে আর সেখানে দাঁড়াইল না, সুমুখের কামরায় যোগীন যেদিকটায় জায়গা করিয়া রাখিয়াছিল, গাড়ীতে উঠিয়া সেইখানে গিয়া সে বসিয়া পড়িল।

পুরী, ওয়ালটেয়ার এবং মাদ্রাজ শেষ করিতে দিন দশেক লাগিয়া গেল। পথে ঘাটে ধর্ম্মশালায় চিন্ময়ীই তাহাদের সেবা করিয়াছে, চা করিয়া দিয়াছে, চা না পাইয়া কাফি তৈরী করিয়াছে, পথ চিনিয়া বাজার করিয়া রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছে। এমন কি ছাড়া কাপড় কাচা এবং বাসন মাজাটি পর্য্যন্ত সে বাদ দেয় নাই। যেমন তাহার স্বাস্থ্য, তেমনি সে পরিশ্রমী। তাহার চরিত্রের বাচালতা এবং ইসারা-ইঙ্গিতগুলা বাদ দিলে তাহার প্রশংসা করিবার অনেক দিক ছিল।

মাদ্রাজ হইতে মাদুরা এবং ত্রিচিনোপল্লী হইয়া যে পথটা সোজা দক্ষিণ দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেই পথে একদিন সকলে আবার গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। শীতকাল, কিন্তু এদেশে শীত নাই, প্রাতঃকাল হইতে বাহিরে শস্য-সবুজ প্রান্তরের চারিদিকে বর্ষা নামিয়াছে, শীতের দিনেই এখন বর্ষাঋতু। কোমল কালো মেঘে দিগদিগন্ত আচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে দিনের বেলাতেও প্রখর বিদ্যুতের ঝলক চোখের উপর দিয়া খেলিয়া যাইতেছিল।

একটিমাত্র নারীর অভাবে যাহার জীবন চিরদিনের মত রিক্ত হয় নাই, সে বুঝিবে না এই দীর্ঘ পথযাত্রার গভীরতর অর্থ কী! ভবেশ নীরবে জানালার ধারে বসিয়া বাহিরের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। গতরাত্রে ঘুম হয় নাই বলিয়া ওপাশে বেঞ্চিতে শুইয়া যোগীন ও চিন্ময়ী পরম নিশ্চিন্তমনে নাক ডাকাইতেছে।

এমনি মেঘমেদুর বর্ষণ মুখর একটি প্রাতঃকালে মায়া বলিয়াছিল, তোমার সঙ্গে দেশ বেড়াতে আমার খুব ভাল লাগে! তাহারা ছিল দুঃখহীন, এই অনন্ত বিশ্বসৃষ্টির নিতান্ত নিভৃতে একটিমাত্র ক্ষুদ্র আশ্রয় ছিল, যেখানে ছিল আনন্দের বাসা, সান্ত্বনার মনোরম নীড়! সেই নগণ্য নীড়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন উঠিল, গ্রহে গ্রহে, তারায় তারায়, সমগ্র সৌরজগতে। মহাকালের বিচারে সেই নীড় রক্ষা পাইল না, ঝড়ের মত মৃত্যু আসিয়া তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া গেল। সার্থক হইল সৃষ্টি-রহস্য!

ভালবাসার মত ক্ষণভঙ্গুর বস্তু সংসারে আর কিছুই নাই—মায়া তাহাকে এই শিক্ষাই দিয়া গিয়াছে।

সেদিন এমনি করিয়াই কাটিয়া গেল। কখনও নামিল বর্ষা, কখনও উঠিল বাতাস, কখনও বা দেখা দিল রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ। পরদিন বেলা আন্দাজ আটটার সময় সমুদ্রের উপর পাম্‌বান পুল পার হইয়া গাড়ী আসিয়া রামেশ্বরমে পৌঁছিল।

ছোট জনবিরল ষ্টেশন। আশপাশে কাঁটার জঙ্গল আর মরুময় মাঠ। তাহাদেরই ওপারে খেজুর এবং নারিকেলের বন দূর বাঙলা দেশের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কোথাও কোথাও কলার ক্ষেত ও পেঁপে গাছের সারি।

ষ্টেশনে নামিতেই একদল পাণ্ডা আসিয়া তাহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। অনেক বাকবিতণ্ডার পর একদল পাণ্ডার সহিত তাহাদের রফা হইল। বাসা তাহার কাছেই, মন্দির হইতে

বেশী দূর নয়। মোটঘাট অতি-সামান্যই, বিছানার বালাই নাই, ছোট ব্যাগটা ভবেশ নিজেই হাতে করিয়া লইল, দুইটা পুঁটুলি যোগীন ও চিন্ময়ী হাতে করিয়া লইয়া চলিল। পথের দুইধার হইতে স্থানীয় ছেলেমেয়েরা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া 'দামড়ির' জন্য হাত পাতিতে লাগিল। পাই পয়সা পাইলেই তাহারা খুসি। দরিদ্র দেশ।

সমুদ্রের উপকূলে মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া এই ছোট শহরটি ভবেশের খুব পছন্দ হইল। ডাব, কলা ও পেঁপে খাইয়া এই-খানে সে দিনকতক বাস করিয়া যাইবে এই মনস্থ করিয়া সে বলিল, 'আমাকে একটা আলাদা ঘর দিও যোগীন, সে ঘরটি আমি এখন আর ছাড়ছিনে। বেশ জায়গা, এ তীর্থে পুণ্যি আছে, কি বল ?'

'আছে বৈ কি, জলটাও এখানকার বেশ হজমী। সমুদ্রের হাওয়ায় ক্ষিধে হয় খুব।'

চিন্ময়ী কহিল, 'একেবারে বাজার করে নিয়ে চলুন, গিয়েই রান্না চড়িয়ে দেবো, দু'দিন ত আপনাদের পেটে অন্ন নেই!'

যোগীন হাসিয়া কহিল, 'নিজের কথাটাও বাদ দিসনে!'

'আমার উপোস করা অভ্যেস আছে।'

ধর্ম্মশালায় পৌঁছিয়া পাণ্ডা তাহাদের জন্য ঘর বাছিয়া দিল। ওদিকের কয়েকটা ঘরে ইতিমধ্যেই বোম্বাই, গুজরাট প্রভৃতি দেশ হইতে জনকয়েক যাত্রী আসিয়া ভিড় করিয়াছে। ঘরের

ভিতর হইতে তাহারা কলার খোসা ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া বাহিরে ফেলিতেছিল।

তীর্থ করিতে ভবেশ আসে নাই, কিন্তু যোগীন ও চিন্ময়ী আসিয়াছে। পাণ্ডার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, বিকালবেলা এখান হইতে কিছু দূরে রামকুণ্ড লক্ষ্মণকুণ্ড প্রভৃতি তাহারা দর্শন করিয়া আসিবে, ভবেশ কোথাও যাইবে না। বেশী পরিশ্রম করিয়া ঘোরাঘুরি করা তাহার রুচিকর নয়।

ধূলা-পায়ে যোগীন ও চিন্ময়ী যখন ঠাকুর দর্শন করিয়া ফিরিল তখন বেলা হইয়াছে। আসিবার সময় তাহারা রান্না-বান্নার আয়োজন সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। আয়োজন সামান্যই, ক্ষুন্নিবৃত্তি মাত্র। কিন্তু তাহাই শেষ করিতে ঘণ্টা তিনেক লাগিয়া গেল।

আহারান্তে দুইজনে দিবা-নিদ্রার সুযোগ খুঁজিতেছে দেখিয়া, ভবেশ বিরক্ত হইয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, যোগীন কহিল, তুমি এলে তবে আমরা বেরুবো ভাই, রইলাম তোমার জিনিসপত্র আগ্‌লে—'

'থাকো।' সামান্য বলিয়া কিছু পয়সা সঙ্গে লইয়া ভবেশ বাহির হইয়া গেল। চিন্ময়ী তখন মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িয়াছে।

পথে বাহির হইয়া ডানহাতি কিছুদূর গিয়া প্রকাণ্ড মন্দির। দক্ষিণ দেশের মন্দিরের ঢঙ্‌ অন্যরকম, উত্তর ভারতের মুসলমানের মসজিদ এবং দুর্গের অনুকরণ করিয়া এদিকের মন্দিরের গঠন নয়। মন্দিরের কারুকার্য্য এবং কলাকুশলতা

সম্পূর্ণ মৌলিক এবং হিন্দুসভ্যতা-সম্মত। ভিতরে ঢুকিবার প্রকাণ্ড প্রবেশ-পথ। পথ পার হইয়া ভিতরে আসিয়া ভবেশ প্রায় দিশাহারা হইয়া গেল, এমন খিলান্, এমন কারুচিত্র, এমন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সজ্জা সে কোথাও দেখে নাই! এ যেন এক নূতন জগতে সে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। মন্দিরের অন্দর-মহলে একটা শহর। দোকান-বাজার, ফেরিওয়ালা, ফুল-বিক্রেতা, ফলের বাজার, মানুষের জটলা, বৈঠক, আন্দোলন। প্রকাণ্ড এক একটা দালান, এধার হইতে ওধারের মানুষ চেনা যায় না, কত পথ, কত বাঁক। ভবেশ দেখিতে দেখিতে চলিল।

ঘণ্টাখানেক তাহার ভিতর ঘুরিয়া একটা নূতন পথ দিয়া সে আসিয়া পড়িল একেবারে সমুদ্রের ধারে। পুরী, ওয়ালটেয়ার এবং মাদ্রাজে সে সমুদ্র দেখিয়া আসিয়াছে, এখানেও সেই সমুদ্র, তেমনি অন্তহীন, অগাধ, কিন্তু তবুও ইহার চেহারা আলাদা। হু হু গর্জ্জন করিয়া বাতাস বহিতেছিল, রৌদ্রের আলোয় উত্তাপ নাই, ভবেশ আসিয়া বালির উপর বসিয়া পড়িল। তিন দিকে সমুদ্র, একদিকে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি স্থলপথ বহুদূর গিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। যতদূর পর্য্যন্ত তাহার দেখা যায়, কেবল কলা আর নারিকেল বন প্রবল বায়ুর বেগে প্রতিনিয়ত আন্দোলিত হইতেছে। নীল সমুদ্র রেখার সহিত মিলিয়াছে সবুজ-শ্যামল প্রান্তর, মাঝখানে তার বালুময় স্বর্ণরেখা। অকস্মাৎ রূপ-উপলব্ধির বন্যায় ভবেশের ভিতরটা যেন

প্লাবিত হইয়া গেল। দক্ষিণ দিকে বহুদূরে চাহিয়া দেখিল, প্রান্তরের ভিতর হইতে একটি অতি ক্ষীণ স্থলরেখা বাহির হইয়া সমুদ্রের গর্ভে কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। সেই পথে ধনুষ্কোড়ি পর্য্যন্ত যাওয়া যায়।

নিমীলিত চক্ষে ভবেশ চুপ করিয়া সেইখানে বসিয়া রহিল। ইহারই জন্য সে আসিয়াছে,—এই অনন্ত রূপ-সমুদ্রের বিরহী-আত্মার সহিত তাহার ব্যর্থ জীবনের পরিচয় হইবে। বাতাস লাগিয়া তাহার চুল উড়িতে লাগিল, গায়ের চাদর উড়িতে লাগিল, তাহার অন্তরের ভিতরেও এই বাতাস প্রবেশ করিয়া অন্দর-বাহির একাকার করিয়া দিল। অতি ক্ষীণ পথ-রেখা যেমন গৃহাঙ্গন হইতে বাহির হইয়া গ্রাম শহর অতিক্রম করিয়া বিপুল পৃথিবীর পথে আসিয়া মিলিত হয়, তেমনি তাহার জীবনও আজ সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়া এই সীমাহীন সমুদ্র-তীরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই তাহার সহজ পরিণাম, এই রাজ্য ছাড়িয়া সে আর কোথাও যাইবে না, আর কোথাও তাহার শান্তি নাই, আলো নাই, আশা নাই,—বাকি জীবনের দিন-গুলি সে এইখানেই অতিবাহিত করিবে। সে ধন্য, সে কৃতার্থ!

কয়েকটা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বড় বড় ঢেউগুলার উপর লাফাইয়া পড়িয়া মাতামাতি করিতেছিল। একধারে দুইটি মেয়ে বসিয়া বসিয়া বাসন মাজিতেছে; তাহারই কিয়দ্দূরে একটি লোক কতকগুলি কাপড়-চোপড় লইয়া সাবান কাচা করিতেছিল। একটা কুকুর কোথা হইতে আসিয়া স্নান করিয়া

চলিয়া গেল। এক জায়গায় কতকগুলি প্রসাদী ফুল পাতা ও চাল লইয়া একটা ছাগল নাড়াচাড়া করিতেছিল।

সূর্য্যের আলো যখন ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসিল তখন ভবেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, এতক্ষণ আত্মবিস্মৃত হইয়া সে যেন কী এক গভীর তপস্যায় মগ্ন ছিল।

বাসায় পৌঁছিয়া দেখিল, ঘরে শিকল তুলিয়া দিয়া যোগীন ও চিন্ময়ী বাহির হইয়া গিয়াছে। বেলা তখন আর বাকী নাই। মন্দিরে আরতি দেখিবার আশায় বাহিরের অন্যান্য যাত্রীরাও যে যার ঘর বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। শিকল খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া সে সটান্ মেঝের উপর শুইয়া পড়িল।

গতরাত্রে তাহার ঘুম হয় নাই, শুইয়া শুইয়া তাহার তন্দ্রা আসিতেছিল। এমনি সময় দরজার কাছে পদশব্দ শুনিয়া সে সজাগ হইয়া উঠিল। দরজার কাছে দাঁড়াইয়া পাণ্ডাঠাকুর কহিল, 'বাবুজি ?'

ভবেশ সাড়া দিয়া কহিল, 'কেন ?'

'আজ কই আপনারা কোথাও গেলেন না, কাল সকালে সব যাবেন ত ?'

'ওরা আপনার সঙ্গে যায়নি ?'

'না, তাঁদের জন্যই ত—'

'তারা তবে কোথায় ?'

পাণ্ডা কহিল, 'আছেন এইখানে কোথাও, নতুন দেশ দেখতে···আমি কাল সকালেই আসব।'

'আচ্ছা।'

পাণ্ডা চলিয়া গেল। ভবেশ আবার চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, রাত বাড়িতে লাগিল কিন্তু তাহারা আসিয়া পৌঁছিল না। এমন দুঃশীল নরনারী আর কোথাও দেখা যায় না! চরিত্রের দোষ তাহাদের নানা দিকে, নানা রূপে। সত্য বটে, তাহাদের মধ্যে অবৈধ প্রণয়-সম্পর্ক ভবেশ লক্ষ্য করে নাই কিন্তু তাহাদের বাচালতা, আহারের লোভ, উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ, অকারণ রসালাপ, কৃত্রিম সন্ন্যাসের আড়ম্বর বহুবার তাহাকে পথে পথে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে। মানুষের নৈতিক অধঃপতন শুধু যে যৌনসম্পর্কে নয়. চরিত্রের আরও বহুতর লক্ষণে, তাহাদের দেখিয়া ভবেশ একথা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিয়াছে। ইহাদের কিছুই না থাকিয়া বরং তাহাদের মধ্যে অবৈধ প্রণয়াসক্তি থাকিলেও সহ্য হইত। তাহাদের বুঝা যাইত।

গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাহারা আসিল না দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ভবেশ দরজা বন্ধ করিবার জন্য উঠিয়া বাহিরে আসিল। দেখিল তাহাদের ঘর ভেজানো, দরজা ঠেলিয়া সে দেখিতে পাইল ভিতরে কিছুই নাই, নিজেদের পুঁটুলিগুলি পর্য্যন্তও তাহারা লইয়া চলিয়া গেছে। পুঁটুলি লইয়া যাইবার অর্থ সে বুঝিতে পারিল না। বুঝিল না বলিয়া দুঃখও সে করিল না, যখন আসে আসুক, যাহা করিবার করুক, তাহাদের লইয়া

মাথা ঘামাইবার সময় তাহার নাই। নিজের ঘরে আসিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া সে শুইয়া পড়িল।

আলোটা মাথার কাছে জ্বলিতেছিল, তাহাতেই লক্ষ্য করিয়া দেখিল, তাহার ছোট ব্যাগটার উপর এক টুক্‌রা কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে। একটু কৌতূহল হইল, উঠিয়া গিয়া কাগজখানা সে আনিয়া বাতির আলোয় পড়িল—

'ভাই ভবেশ'

কিছু মনে করো না, তোমারই কালি ও কলম নিয়ে তোমায় চিঠি লিখে যাচ্ছি। আমরা তোমার সঙ্গে থাকায় তোমার অসুবিধে হচ্ছে, আমরা তাই চলে যেতে বাধ্য হলাম। যাবার সময় তোমার সঙ্গে দেখা করা চলল না কারণ তোমার ব্যাগের ভেতর যে টাকাকড়িগুলি ছিল সেগুলি তোমাকে না বলেই আমি ধার নিয়ে গেলাম, সামান্য শ' পাঁচেক টাকা, আশা করি ক্ষমা করবে। তুমি উদার এবং মহানুভব তাই ভরসা করি পুলিশে খবর দিয়ে আমাদের খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবে না। ভালবাসা নিও।

যোগানন্দ'

ভবেশ টলিতে টলিতে আবার উঠিল, দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া একবার ভাবিল চীৎকার করিয়া কাহাকেও ডাকে, কিন্তু গলার আওয়াজ বাহির হইল না, দেয়াল ধরিয়া ধপ্‌ করিয়া মেঝের উপরেই ধূলা-বালিতে বসিয়া পড়িল।

ভোর বেলা যাত্রীদের কলরবে তাহার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

একবার সে চোখ চাহিয়া আবার বুজিল, একবার সে উঠিয়া ঘরে যাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না, মনে হইল তাহার শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ভাঙিয়া গিয়াছে, আর উঠিবার শক্তি নাই। ওই দুইটী নরনারী শুধু যে তাহাকে নিঃস্ব করিয়া গিয়াছে তাহাই নয়, তাহার বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, আশা, আনন্দ সমস্তই হরণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরেই পাণ্ডাঠাকুর তাহার কথামত আসিয়া দাঁড়াইল। একটু বিস্মিত হইয়া কহিল, 'বাবুজি ?'

ভবেশ চোখ খুলিয়া অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকাইল।

'আপনার কি শরীর ভাল নেই বাবুজি ?'

'না।'

'জ্বর হয়েছে ?'

'বোধ হয়।'

'এখানে ডাক্তার একজন আছেন, যাবেন ?'

'চলুন।' বলিয়া ভবেশ বসিয়াই রহিল, উঠিল না।

পাণ্ডা কহিল, 'তাঁরা কোথায় ?'

'তাঁরা ? কার কথা বল্‌ছেন ?'

'ওই, আপনার সঙ্গে যাঁরা—'

'তাঁরা ত নেই ?'

'মন্দিরে গেছেন বুঝি ?'

'মন্দিরে ? না, তারা গেছে মাদুরা, কাল বিকেলের গাড়ীতে।'

পাণ্ডা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'তাঁরা কে আপনার বাবুজি?'

ভবেশ তাহার সন্দেহ দেখিয়া একটু হাসিল। বলিল, 'আমার ভাই আর বোন। আপনি এখন যান্ পাণ্ডাজি, আমি আছি, থাকবো এখন।'

পাণ্ডা চলিয়া যাইতেছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'আজ স্নান করতে যাবেন কি? ধনুষ্কোডিতে আজ চন্দ্রগ্রহণ, এখান থেকে অনেকেই যাবে।'

ভবেশ কহিল, 'আচ্ছা দেখি কি হয়।'

পাণ্ডা চলিয়া যাইবার পর সে উঠিয়া খানিকক্ষণ পায়চারি করিল। যাক্ এবার সে বাঁচিয়া গেল, দূর দেশে একান্ত নিঃসম্বল হইয়া সে বাঁচিল। হারাইলে কেহ খুঁজিবে না, মরিলে কেহ কাঁদিবে না। দেশে বিধবা মা আছেন, একদিন হয়ত তাঁহার কাণে সংবাদ পৌঁছিবে, হয়ত কোনো দিন পৌঁছিবেও না! আঃ এবার সে বাঁচিল! অসীম তৃপ্তি, বেপরোয়া আনন্দ! বাস্তবিক, পথে নামিয়া যে মানুষ রিক্ত ও সর্ব্বহারা হয় নাই, অতি দরিদ্র তাহার জীবন।

কেন তাহার এই মানসিক উদ্বেগ? কোথায় তাহার আকর্ষণ? কেনই বা সে দেশে ফিরিবে? কাহার জন্য? সামান্য শিক্ষা দীক্ষা, সামান্য সংসার, নিস্প্রয়োজনীয় আত্মীয় পরিজন, সৌখীন বন্ধু সমাজ—ইহাদের অবলম্বন করিয়া উদ্দেশ্য-হীন হইয়া দিনের পর দিন অকারণ জীবন ধারণের মূল্য কী?

না, সে আর দেশে ফিরিয়া যাইবে না, সেখানকার মমতা সে বিসর্জ্জন দিয়াছে। এই মন্দিরের দ্বারে প্রসাদভিক্ষু হইয়া পড়িয়া থাকার যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ তাহা শুধু সেই অনুভব করিতে পারে। আশ্রয় তাহার জুটিয়া যাইবে, আশ্রয় পশু-পক্ষীরও আছে!

পথে বাহির হইয়া সমস্ত সকালটা সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল। এই ভাল। সাগরের হাওয়ায় সে তাহার জীর্ণ সজ্জা উড়াইয়া আনন্দ করিয়া বেড়াইবে। এখন হইতে তাহার উচ্চ আশা, বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা, বিচিত্রতর স্বপ্ন কিছু নাই। এই ভাল! এই ভাল! মানুষের সহিত আর সে বাস করিবে না, তাল আর নারিকেলের বনে বনে, বালুময়, বেলাভূমিতে, নির্জ্জন পর্ব্বত-চূড়ায়, গহন অরণ্যানীতে নৃত্য করিয়া বেড়াইবে! যাহারা পাপ করে নাই, যাহারা কাহাকেও কাঁদায় নাই, জীবন যাহাদের বহু গ্লানিতে ব্যর্থ হয় নাই, সেই সব শিশুদিগকে সে ভাল-বাসিবে, তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিবে। সমুদ্রের তীরে বসিয়া বসিয়া সে তরঙ্গ গণিবে, গোধূলির অবসন্ন আলোকে সে অদৃশ্যমান হংস-বলাকার দিকে চাহিয়া থাকিবে, আরতির শাঁখ ঘণ্টা শুনিবে,—আঃ এবার সে বাঁচিয়া গেল!

ষ্টেশনের কাছে আসিয়া দেখিল, যাত্রীর ভিড়, গ্রহণে সবাই স্নান করিতে চলিয়াছে। এই সব নিরর্থক পুণ্যকামনায় তাহার চিরদিনের বিরক্তি। ভাবিল, ফিরিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু সে ফিরিল না, অথচ নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই কয়েকটি পয়সা দিয়া সে

একখানা ধনুষ্কোড়ির টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। পকেটে আর গোটা চারেক মাত্র পয়সা পড়িয়া রহিল।

কিছুক্ষণ বসিয়া আর তাহার ভাল লাগিল না, আবার সে নামিয়া আসিল। যাত্রীর কলরব ও কলকণ্ঠের স্রোতে সে ভাসিয়া যাইবে এ রকম মেরুদণ্ডহীনতা তাহার নাই, তাহার প্রয়োজন নির্জ্জন একাকীত্ব। মানুষের প্রতিদিনের কোলাহলের ভিতরে তাহার তপস্যা নাই, কোনো দিন থাকিবে না, তাহার তপস্যা আকাশে আকাশে, সাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে, বায়ুতাড়িত তাল-খেজুরের মর্ম্মরে মর্ম্মরে, সোণার সূর্য্যালোকে, চম্পক যূথীবেলার গন্ধে গন্ধে।

বাঁশী বাজাইয়া নিশান উড়াইয়া গাড়ী যখন ছাড়িয়া দিল, তখন কী মনে হইল, ছুটিয়া গিয়া হাতলটা ধরিয়া চলন্ত গাড়ীতে সে উঠিয়া পড়িল।

দুই ধারে সমুদ্র, মাঝখানে অতি সঙ্কীর্ণ রেলপথ। সে পথে ট্রেণ ছাড়া আর কোনো যান-বাহনের যাতায়াত করিবার উপায় নাই। বড় বড় ঢেউয়ের উচ্ছ্বাস কখনও কখনও লাইনের স্লিপারে আসিয়া লাগে। সামান্য কয়েক মাইল পথ, কিন্তু গাড়ীর গতি দ্রুত নয়, যাত্রীগণকে সমুদ্রের শোভা দেখাইতে দেখাইতে লইয়া যাওয়াই যেন তাহার কাজ। ভবেশ জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া বসিয়া রহিল।

দিন ফুরাইল, আকাশ হইল ধূসর বর্ণ, ধনুষ্কোড়ি ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিল। ষ্টেশনে নামিয়া প্রথমেই চোখে পড়িল,

দূর সমুদ্রতল হইতে পূর্ণিমার পরিপূর্ণ চন্দ্র আকাশের কিছুদূরে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। ওদিকে বড় একটা জেটিতে সিংহল দ্বীপের একখানা যাত্রী-জাহাজ দাঁড়াইয়া বাঁশী বাজাইতেছে। ঝড়ের মত চঞ্চল বাতাস হু হু গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিয়া বেড়াইতেছিল।

ছোট্ট ষ্টেশন হইতে বালুময় সঙ্কীর্ণ পথের উপর নামিয়া ভবেশ চারিদিকে একবার তাকাইয়া দেখিল। এ কোথায় সে আসিয়া পড়িয়াছে? চারিদিকে জল, জল আর জল! দক্ষিণ মহাসমুদ্রের গর্জ্জমান জলের অবিশ্রান্ত আর্ত্তনাদ, কোথাও কূল নাই, তীর নাই, গাছপালা নাই, মৃত্তিকার চিহ্নমাত্র নাই! বুকের ভিতরে তাহার একটা দুরন্ত উল্লাস ধক্ ধক্ করিতে লাগিল। দুইটা চোখ দিয়া এই যাহা সে দেখিতেছে, এ কি অনন্ত জীবন, না ভয়-ভীষণ মৃত্যু! ক্ষুধা-তৃষ্ণা সে ভুলিয়া গেল, ভুলিয়া গেল যে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, ভুলিয়া গেল যে, সে এক-জন সহায় সম্বলশূন্য পথিক, বায়ুর বেগ তাহাকে মাতালের মত ঠেলিয়া ঠেলিয়া ক্রম-বিলীয়মান পথ-রেখা দিয়া লইয়া চলিল, উড়ন্ত বালুর কণা সর্ব্বাঙ্গে বিঁধিতেছে, বাতাসের গতি তাহার পা মচ্‌কাইয়া বার বার ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কোথায় মানুষ, কোথায় সেই পুণ্যলোভী যাত্রীর দল, কোথায় বা শস্য-শ্যামল পৃথিবীর চিহ্ন,—পিছনে ফিরিয়া সে একবার দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু চোখ চাহিতে পারিল না, তীক্ষ্ণ বালুর কণা তাহার মুখে, চোখে, নাকে,

সর্ব্বদেহে অবিশ্রান্ত ছুঁচের মত আসিয়া বিঁধিতেছিল। সর্ব্ব-শরীর জ্বালা করিতেছে, বায়ুবেগে ভাল করিয়া নিশ্বাস লইবার উপায় ছিল না, বেশী হাওয়া নাকে মুখে ঢুকিয়া দম আট্‌কাইয়া যায়,—কেবল সে একবার মনে মনে অনুভব করিয়া দেখিল, সম্মুখে ও পশ্চাতের অন্ধকারে তাহার সঙ্গীরা কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। সে নিজেও, পথে কোথায় যেন সে শুনিয়া আসিয়াছিল এই পথের প্রান্তেই একদিন রামচন্দ্র সীতা-উদ্ধার করিতে আসিয়া ধনুর্ব্বাণ রাখিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন, নাম তাই ইহার ধনুষ্কোডি।

বাতাসের বেগ কমিল না কিন্তু অন্ধকারে বহুদূর পর্য্যন্ত আসিয়া এক সময় ভবেশ চোখ খুলিয়া চাহিতে পারিল। বালির ছিটা কমিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু সমুদ্র-তরঙ্গের গর্জ্জনে কানে তালা লাগিবার উপক্রম হইল। হিংস্র বন্য জন্তুর মত পর্ব্বত-প্রমাণ এক একটি ঢেউ তাহার নিকটে আসিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছিল। আকাশ আর সাগর মিশিয়া কোথায় যেন অন্ধকারে একাকার হইয়া গিয়াছে, শুধু পরিপূর্ণ চন্দ্রালোকে সমুদ্রগর্ভে অগণ্য নক্ষত্ররাজি ঝল্‌মল্‌ করিয়া আন্দোলিত হইতে লাগিল। বিহ্বল হইয়া ভবেশ চারিদিকে একবার তাকাইল।

ঘণ্টাখানেক পরে সে একটা উঁচু বালিয়াড়ির উপর বহু-কষ্টে ও বহু পরিশ্রমে উঠিয়া আসিতে পারিল। নিকটে একটি পাতার ঘর, দ্বীপের মত, আশপাশে গুটি দুই তিন নারিকেল গাছ, আর কিছু নাই। আলো দেখিয়া ভিতরে মানুষ

আছে বোঝা গেল। সমুদ্র-গর্ভের এই লোকালয়টুকু ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, স্পষ্টই সে দেখিতে পাইল। ঝড়ের হাওয়ায় গাছ কয়টি মাথা কুটিতেছে, তবুও দেখা গেল তাহাদের পাতার উপর নির্ম্মল চাঁদের আলো পড়িয়া রূপার পাতের মত ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। চন্দ্রালোকের এমন অপূর্ব্ব শোভা সে এমন করিয়া আর কোনোদিন দেখিয়াছে বলিয়া মনে পড়িল না।

খুঁজিয়া খুঁজিয়া সে একটা ভিতরের প্রবেশ-পথ বাহির করিল, গুহার মুখের মত ক্ষুদ্র, তাহারই কাছে আসিয়া হামাগুড়ি দিয়া সে ঢুকিতেছিল, কিন্তু বালির ঢিপির উপর হইতে হঠাৎ পা পিছলাইয়া গড়াইয়া অত্যন্ত বিসদৃশভাবে সে দরজার ভিতরে আসিয়া হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িল।

তাহার এই অস্বাভাবিক প্রবেশে ভিতরের মানুষগুলি চম্‌কাইয়া ঘাড় ফিরাইয়া গোলমাল করিয়া উঠিল। উঠিবার কারণও ছিল, তাহার চেহারা ঠিক সাধারণ যাত্রীর মত নয়, তাহাকে দেখিয়া ডাকাতের দলের লোক মনে হইতেও পারে কিম্বা কোনো নরখাদক জানোয়ারের ভয়ে পলায়মান পথিক বলিয়াও ধারণা হইতে পারে। মুখ তুলিয়া ভবেশ তাকাইল।

একটি লোক, বোধ করি মন্দির-রক্ষক, কাছে আসিয়া কহিল, 'তুম্ যাত্রী হ্যায় ?'

শ্রান্ত কণ্ঠে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া ভবেশ কহিল, 'হ্যাঁ গো ঠাকুর, আমি যাত্রী, অত সন্দেহ কিসের ?'

লোকটা বোধ হয় তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া কথাটা বিশ্বাস করিল। বাংলা সে বুঝিল না বটে কিন্তু বক্তব্যটা বুঝিয়া অন্যান্য স্ত্রীপুরুষদের অভয় দিল।

অত্যন্ত ক্ষুদ্র পাতা-ছাওয়া ঘর, এবং তাহার চেয়েও ক্ষুদ্র মন্দির। হাত দুই লম্বা-চওড়া একটা পাথর আর বালির গহ্বরে তিনটি শ্বেতপাথরের মূর্ত্তি দাঁড় করানো,—রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ। পূজার যত সামান্য আয়োজন সুমুখে পড়িয়া রহিয়াছে। ভিতরে একটি মাত্র তেলের প্রদীপ টিম্ টিম্ করিয়া জ্বলিয়া অন্ধকারকে আরও রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে। আলো যাহাতে বাতাসে নিবিয়া না যায় তাহার জন্য প্রদীপটি অতি হাস্যকর ভাবে লুকানো রহিয়াছে। ভবেশ আর উঠিবার চেষ্টা করিল না, বসিয়া বসিয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। বাঁ হাতের কাছে বালি ও পাথর দিয়া হাতখানেক উঁচু একটা পেটি গাঁথা এবং তাহারই উপর চাটাই পাতিয়া স্থানাভাবে কুণ্ডলী পাকাইয়া চার পাঁচ জন যাত্রী পড়িয়া ছিল। তাহারা স্ত্রী কি পুরুষ তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। ওধারে ঠাকুরের পাশে দুই জন তৈলঙ্গী স্ত্রীপুরুষ বসিয়া বসিয়া ধূমপান করিতেছে, তাহাদের কোলের কাছে কতকগুলি কলা, চিঁড়ে, এবং ছোট একটা হাঁড়িতে খানিকটা দই। বাহিরে সাগরের বাতাস গর্জ্জন করিয়া ছুটাছুটি করিতেছিল এবং তাহারই বেগে ভীত ও ত্রস্ত যাত্রীগণের মাথার উপর দুর্ব্বল ঘরখানি এক একবার দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। ঘর যদি ভাঙিয়া পড়ে তাহা

হইলে আর কাহারও রক্ষা নাই, বাঁশের কঞ্চির বাঁধুনিগুলিতে মচ্ মচ্ করিয়া শব্দ হইতেছিল। ঘরের অসংখ্য ছিদ্র দিয়া বাহির হইতে চাঁদের আলো ভিতরে উঁকি মারিতেছে।

'তবে তুমি বাঙালীর ছেলে, কেমন বাবা ?'

ভবেশ চকিত হইয়া ঘাড় ফিরাইল। স্বল্প আলোকে সে দেখিল, একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিয়াছে। স্ত্রীলোকটির কণ্ঠস্বরে আনন্দ ও ভয়হীনতার আভাস পাইয়া ভবেশ ধীরে ধীরে কহিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আঃ বাঁচলাম, বাঁচলাম বাবা। ভয়ে মরি ; দেশের লোক কেউ নেই, এত পথ পার হয়ে যাবো কেমন করে ? এত দূরে তুমি কেন এসেচ বাবা, তীর্থ করতে ?'

ভবেশ সবিনয়ে চুপ করিয়া রহিল। মহিলাটি বলিতে লাগিলেন, 'আমরা বাবা এসেছিলাম রামেশ্বরে, কপাল-গুণে গেরণ লাগ্‌ল, ভাবলাম তবে ধনুষ্কোটিতে একটা ডুব দিয়েই যাই, আমরা এসেছি দিনের বেলা, কী কষ্ট বাবা এইটুকু আসতে, পরের মেয়েকে সঙ্গে এনেছি সাওস করে, ভালয় ভালয় এখন···এসো বাবা, পেটির ওপর উঠে এসে বসো।'

পেটির একটা ধারে ভবেশ উঠিয়া বসিল। বলিল, 'কোথা থেকে আসচেন আপনারা ?'

'আমরা ? সে কথা আর বলো না বাবা, এখান থেকে আমাদের যাবার কথা দ্বারকার দিকে, কিন্তু এ যাত্রায় আর হলো না······ভট্‌চায্যি মশাইকে পুরীতে ফেলে এসেচি, পথে

বেরিয়ে তাঁর জ্বর এলো……কী কপাল, তবু ভাবলাম বাবা যা থাকে কপালে, দুর্গা বলে গাড়ীতে উঠে পড়ি……অনেক কষ্টে এসেচি বাবা রামেশ্বরে।'

ভবেশ অতি শ্রদ্ধা ভরে তাঁহার কথা শুনিতে লাগিল। মহিলাটি পুনরায় বলিলেন, 'মাদ্রাজ থেকে এলাম মন্দিরে, মন্দিরের মন্দিরটি বাবা বেশ……'

হঠাৎ তাঁহার কথায় বাধা দিয়া তাঁহারই কোলের নিকট হইতে নারী-কণ্ঠের উচ্ছ্বসিত হাসি শোনা গেল।

'ওমা আমি বলি তুই ঘুমোচ্চিস বুঝি, ওঠ্ তবে ভাই প্রমীলা, উঠে বোস্, সময় বুঝি হয়ে এলো।'

একটি মেয়ে হাসিতে হাসিতে উঠিয়া বসিল। বলিল, 'দিদিমার কিছুতেই মনে থাকবে না যে, ওটা মন্দিরে নয়, মাদুরা! মাদুরা, মাদুরা, মাদুরা! এবার মনে থাকবে তোমার?'

দিদিমা হাসিয়া বলিলেন, 'না ভাই, থাকবে না।'

দূর পথের যাত্রীরা পরস্পর যতই অপরিচিত হউক, দেখা হইলে কোথায় যেন তাহারা একটি হৃদ্যতা অনুভব করে। অপরিচয়ের সাধারণ বাধা ও নিষেধ অতিক্রম করিয়া স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সহজেই আলাপ হইয়া যায়। সমাজ যেখানে নাই সেখানে সবাই সহজ। কথাগুলি যে প্রমীলা তাহারই মুখের দিকে ফিরিয়া তাহাকেই শুনাইয়া কহিল, ঘাড় হেঁট করিয়া ভবেশ তাহা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিল।

ঝড়ে বিপর্য্যস্ত, ক্ষুধায় ক্লান্ত, পথশ্রমে হতশক্তি—ভবেশের

দিকে প্রমীলা ফিরিয়া তাকাইল এবং যে-কথাটি এতক্ষণ পর্য্যন্তও দিদিমা জিজ্ঞাসা করেন নাই, সেই কথাটাই সে বলিয়া ফেলিল, 'আপনি কি একলা এসেচেন ?'

পরিষ্কার, নির্ভীক এবং অবিচলিত কণ্ঠস্বর, সে কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়া তাহার মুখের ঔজ্জ্বল্যটুকুও যেন অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া ভবেশের চোখে ফুটিয়া উঠিল। সে কণ্ঠে কোথায় যেন নারী-হৃদয়ের অতি ঈষৎ একটি গোপন মমতা বাহির হইয়া পড়িল। ভবেশ সলজ্জ ও কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

আর কিছু প্রমীলা জিজ্ঞাসা করিল না, করাটা শোভনও হইত না। দিদিমা কহিলেন, 'একলা এলে বাবা, এত অল্প বয়েস···আমরা বুড়ো মানুষ, আমাদের মানায় তীর্থ করা।'

প্রমীলা কহিল, 'তাহলে আমাকে মানায় কেমন করে দিদিমা ?'

দিদিমা কহিলেন, 'মেয়েমানুষের সকল বয়সেই তীর্থ মানায় ভাই।'

'সে আমি মানিনে, মেয়েমানুষ বলেই কি আমাদের পাপ এত বেশী।'

শাণিত তীক্ষ্ণ তাহার কথালাপ। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ভিতর দিয়া তাহার মার্জ্জিত কথাগুলি বাহির হইয়া আসে।

'তা বৈকি ভাই', দিদিমা কহিলেন, 'মেয়েমানুষ হয়ে জন্মানোই মস্ত বড় পাপ। তাই যদি না হবে, তাহলে তোমার এমন দশা হবে কেন ?' ভবেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'কি

বল বাবা? এই প্রমীলার কথা বল্‌চি······কী অভাব ছিল তোমার? আঠারো বছর বয়সেই তোমার যে সব উড়ে পুড়ে গেল, সে ত তোমার কপাল দোষেই! নৈলে হাতীশালায় হাতী, ঘোড়াশালায় ঘোড়া······তোমার ঐশ্বয্যি ভোগ করে কে? পোড়া কপাল আর কি!'

ভবেশ তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। প্রমীলা তাহার পোড়াকপালের গল্প শুনিয়া এতটুকু দমিল না, বরং হাসিয়া কহিল, 'বাস, একজন কাউকে পেলেই হলো, আমার কাহিনীটা দিদিমা তার কাছে বল্‌বেই, বুড়ো হলে মাত্রাজ্ঞান থাকে না! হ্যাঁ, তারপর দিদিমা?

হাতীশালায় হাতী আর ঘোড়াশালায় ঘোড়া ··· তারপর? তেপান্তর সেখান থেকে কতদূর?'

দিদিমা কহিলেন, 'সব কথাতেই মেয়ের ঠাট্টা, এসব কি আমার মিছে কথা? এসব ছিল না তোর, তোর কি আজ এক হাঁটু বালি ভেঙে আমার সঙ্গে তীর্থে আসবার কথা?'

তাঁহার উত্তেজনা দেখিয়া প্রমীলা ভবেশের দিকে একবার তাকাইল, তারপর কহিল, 'না, কিছুতেই না! হ'লো ত, এবার চুপ কর?'

'চুপ আমি করেই আছি!'

যাহারা শুইয়া ছিল তাহাদের আর একজন এই সময় মুখের ঢাকা খুলিয়া উঠিয়া বসিল। এদিক ওদিক তাকাইয়া কহিল, 'অ দিদি, অ প্রমীলা, সময় হয়নি এখনো? ঘুমিয়ে পড়েছি মা,

—স্বপন দেখেচি……বাড়ীতে'রাঁধতে বসে যেন হাত পুড়ে গেছে! কী জ্বালা!'

প্রমীলা কহিল, 'ধন্য মাসি, ধন্য তোমার স্বপ্ন, ক্ষিধে পেয়েছে বুঝি?'

মাসি হাসিল। বলিল, 'পাতানো সম্পর্ক বলেই এমন ঠাট্টাটা তুই করে' নিলি প্রমীলা! সত্যি মাসি হলে—'

'সত্যি মাসি হলে তোমার এই নাক ডাকিয়ে ঘুমুনোর জন্যে দেশালাইয়ের কাঠি দিয়ে মায়ের আঙুল পুড়িয়ে দিতাম।'

'ওমা, একি খুনে মেয়ে গো? তোর সঙ্গে পথে বেরুনো… …দেখিস্ যেন চলন্ত গাড়ী থেকে ঠেলে ফেলে দিসনে!'

'সাবধান।' বলিয়া দিদিমা ও মাসিমার সহিত প্রমীলাও হাসিয়া উঠিল।

পূজারী ঘণ্টা বাজাইল, এবার গ্রহণ লাগিবে। স্পর্শস্নান করিবে বলিয়া সবাই গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দিদিমা উঠিলেন, মাসি উঠিল। প্রমীলাও গায়ের চাদরটা ভাল করিয়া জড়াইয়া পেটি হইতে নামিয়া আসিল।

মাসি একবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'এটি আবার কে দিদি, তখন ত দেখিনি?'

দিদিমা কহিলেন, 'ওটি আমার নাতি, এখানে কুড়িয়ে পেলাম,—ভগবান জুটিয়ে দিলেন ভাই,—তুমি চান্ করবে না বাবা?'

ভবেশ কহিল, 'থাকগে, এমনিই গ্রহণ দেখবো।'

মাসি কহিল, 'তোমার নাম কি ?'

'ভবেশ।'

'ও, চেনা নাম। আমার দেওরপোর নামও ভবেশ, খড়গ-পুর রেলে চাকরি করে। বাড়ী কোথায় ?'

'রংপুরের কাছে।' ভবেশ কহিল।

আর কথা বলিবার সময় ছিল না। দিদিমা কহিলেন, 'তোমার নাওয়া হবে না প্রমীলা, জল স্পর্শ করো।' বলিতে বলিতে আর সকলের সহিত তিন জনে বাহির হইয়া গেল। ভিতরে আর কেহই রহিল না।

মিনিট দশেক পরে ঘাড় ফিরাইয়া ভবেশ দেখিল, প্রমীলা আসিয়া ভিতরে ঢুকিতেছে। মুখের দিকে সে তাকাইতে পারিল না, সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া এক পাশে বসিয়া রহিল। প্রমীলা আসিয়া পোঁটলা পুঁটলি খুলিয়া কি যেন নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

এক সময় সে ঘাড় তুলিয়া স্নিগ্ধ-মৃদুকণ্ঠে কহিল, 'আপনি চানও করলেন না, গ্রহণও দেখলেন না, তবে এলেন কি জন্যে ?'

ভবেশ কহিল, 'এখানে আমার আসবার ইচ্ছে ছিল না।'

'ইচ্ছে ছিল না অথচ এলেন ? এ যে একেবারে হেঁয়ালি !'—প্রমীলা হাসিয়া কহিল, 'পুরুষ মানুষ আজকাল বড্ড রহস্যময় হয়ে উঠ্‌ছে !'

ভবেশ চুপ করিয়া রহিল। প্রমীলা পুনরায় কহিল, 'সঙ্গে আপনার জিনিসপত্র নেই ?'

'একটা ব্যাগ আছে,' ঢোক গিলিয়া ভবেশ কহিল, 'সে আমার আর চাইনে।'

'চাইনে? হঠাৎ সন্নিসি হয়ে গেলেন কেন? কোথায় সেটা ফেললেন?'

'রামেশ্বরের ধর্ম্মশালায় পড়ে আছে।'

প্রমীলা কিয়ৎক্ষণ বিস্ময়াকুল দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইল, তারপর সহজ কোমল কণ্ঠে কহিল, 'এক কাপড়ে চলবে? খাওয়া দাওয়া হচ্ছে কি করে?'

'কাল সকালে একবার খেয়েছিলাম।' ভবেশ বলিল।

বড় বড় চোখে চাহিয়া প্রমীলা কহিল, 'তারপর থেকে না খেয়ে রয়েছেন? কী দুঃখে? আপনাকে দেখেই তখন আমার মনে হয়েছিল যে······কি হয়েছে আপনার বলুন না? সমস্ত কাজের পেছনেই একটা কারণ থাকে!'

ভবেশ কহিল, 'আমার নেই! তা ছাড়া দুঃখের ফিরি করে বেড়ানো আমার অভ্যেস নয়।'

দরজার দিকে একবার তাকাইয়া প্রমীলা সকৌতুকে হাসিল। হাসিয়া কহিল, 'এর উত্তর পরে দেবো। বলছি যে উপোস করে পথের কষ্টে যদি অসুখ করে?'

ভবেশ চুপ করিয়া রহিল। প্রমীলা কহিল, 'আমাদের সঙ্গেই ফিরবেন ত?'

'আপনাদের সঙ্গে?' অর্থসম্বলহীন অবস্থার কথাটা ভাবিয়া ভবেশ কহিল, 'ঠিক এখন বলতে পারিনে।'

মানুষের সাড়া পাইয়া প্রমীলা চট্ করিয়া নিজেকে সংযত করিয়া আবার পিছন ফিরিয়া বসিল। কিন্তু দেখা গেল, আর কেহ নয় পূজারী আসিয়া ঢুকিয়াছে। তখন সে আবার মুখ ফিরাইয়া চুপি চুপি কহিল, 'ছেলে মানুষী করবেন না, আমাদের সঙ্গেই আপনাকে ফিরে যেতে হবে।' বলিয়া এদিক ওদিক তাকাইয়া নিজেদের জন্য যে ফলার সে মাখিতেছিল, তাহারই কিয়ৎপরিমাণ একখানা কলার পাতায় করিয়া লুকাইয়া সে ভবেশের কোলের কাছে দিয়া কহিল, 'খেয়ে নিন্, ফেলবেন না যেন।' বলিয়াই সে উঠিয়া আসিল।

দিদিমা ও মাসি ভিজা কাপড়ে ভিতরে ঢুকিতেছিলেন; তাঁহাদের দেখিয়া চঞ্চল হইয়া প্রমীলা কহিল, 'এলে তোমরা, কী নাওয়া বাবা দু'ঘন্টা ধরে', একলা আমি থাকতে পারিনে যে! ফলার মেখেছি, কাপড় ছেড়ে খেতে বসো।' বলিয়া অতি আনন্দে হাসিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে আনিল।

ভবেশ তখন সত্যই ফলার খাইতেছে। খাইতে খাইতে সে একবার সকৃতজ্ঞ সলজ্জ দৃষ্টি তুলিয়া প্রমীলার দুইটি আয়ত চক্ষুর দিকে তাকাইল। এক মিনিট মাত্র আগে যে-নাটকের অভিনয় হইয়া গেল তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না।

রাত তখন গভীর হইয়া উঠিয়াছে।

গ্রহণ ছাড়িয়া গেলে মোক্ষ-স্নান করিয়া সবাই যখন যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল তখন রাত প্রায় তিনটা বাজে। ভোর পাঁচটার সময় ধনুষ্কোডি হইতে রামেশ্বরের গাড়ী ছাড়িবে।

কিন্তু মন্দিরের বাহিরে আসিয়া সকলে যে অপ্রত্যাশিত বিপদের সম্মুখীন হইল, তাহাতে যাত্রীগণের চক্ষু কপালে উঠিয়া গেল। পূর্ণিমার কোটালে পথের রেখা জলে-জলে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সে জল ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিবে এবং তিন চারি দিনের মধ্যে কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। প্রাণের ভয়ে ভীত হইয়া সকলে মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল। ছোট্ট এই মন্দিরটি যতদূর পর্য্যন্ত চন্দ্রের আলোয় দেখা যায় বিক্ষুব্ধ তরঙ্গা-ন্দোলিত জলরাশি ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। অথচ আর সময়ও ছিল না, এখানে নির্ব্বাসিত হইয়া থাকিলে উপবাস করিয়া মরিতে হইবে, ফিরিয়া যাওয়া ছাড়া কোন উপায়ই নাই। ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিতে তাকাইয়া অশ্রুজড়িত কণ্ঠে দিদিমা কহিলেন, 'কী হবে দাদা ? পরের মেয়েকে সঙ্গে আনলাম···হে ভগবান !'

ভবেশ কহিল, 'যেতে আপনাদের হবেই। বেশী নয়, এক হাঁটু জল······এই বেলা বেরুতে হবে। এর পর—'

তখন আর পিছন ফিরিয়া তাকাইবার সময় কাহারও ছিল না। তখন আসল গতি, আত্মরক্ষার উদ্দাম উত্তেজনা, ভয়ের তাড়না। পথের চিহ্ন নাই, তবু আন্দাজে উত্তর দিক নির্ণয় করিয়া সকলে দুর্গা বলিয়া জলের উপর নামিয়া পড়িল। বেপরোয়া, মরিয়া নিরুপায় তীর্থ-পথিকের দল।

মাসি চলিল সর্ব্বাগ্রে, জলের উপর দিয়া দৌড়ানো যায় না, তবু তাহার দ্রুতগতি দেখিয়া প্রমীলা হাসিল। দিদিমা চলিয়াছেন আগে আগে, মধ্যবর্ত্তিনী, পিছনে পড়িল প্রমীলা। তাহারও পিছনে ভবেশ।

পশ্চাতে থাকিয়া প্রমীলা বার বার সাড়া দিতে লাগিল কিন্তু বাতাসের শব্দে আর জলের আর্ত্তনাদে তাহার গলার আওয়াজ কিছু শুনা যাইতেছিল না। শুধু সে দিদিমার অস্পষ্ট ছায়াকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল।

'মানুষকে চেনার এমন সুবিধে আর নেই, বিপদেই তার পরিচয়।'

জলের উপর দিয়া চলিতে চলিতে ভবেশ কহিল, 'কেবল বিপদ কেন, সম্পদেও চেনা যায়।'

প্রমীলা বলিল, 'এ ভালই হয়েছে, এর চেয়ে কঠিন বিপদে পড়লেও আমি খুসী হতাম।'

'এর চেয়েও কঠিন বিপদ? সে ত মৃত্যু! এতে খুসী হবার কী আছে?'

'সুবিধে পেলাম আপনার সঙ্গে কথা বলবার। ওঁরা ছুটুন, আমরা চলি আস্তে আস্তে।'

ভবেশ বিস্মিত হইয়া কহিল, 'আস্তে আস্তে? যদি জল বেশী বেড়ে যায়?'

প্রমীলার গায়ের চাদর এবং কাপড় বায়ুর বেগে আকুল হইয়া উড়িতেছিল, মাথার ঘোমটা খুলিয়া বিস্রস্ত শুষ্ক চুলের

রাশি ছড়াইয়া যাইতেছে। সে হাসিতে মুখখানি উদ্ভাসিত করিয়া কহিল, 'বাড়ুক, বাড়ুক, জল, আরো বাড়ুক—ভেসে যাক্ সব। ওই মন্দিরটাও যদি ডুবে যেত! হায়রে, দেবতারা বড় স্বার্থপর!'

'আপনার সাহস ত কম নয়!'

ঝড়ের মত প্রমীলা হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'কেউ নেই এখানে, দিদিমা নেই, মাসি নেই, সন্দেহ আর শাসন দুইই নেই—কী আনন্দ ভাবতে পারেন? মাসি আমাকে চোখে চোখে রাখবার চেষ্টা করে! কী মজা! ভাঙুক সব, জলে ডুবে যাক্, ঝড়ে চুরমার হোক.........আসুন আমার সঙ্গে সঙ্গে—' বলিয়া সে নিজেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া ভবেশের সঙ্গ লইল।

ভবেশ বলিল, 'আমি সাঁতার জানিনে, আপনি জানেন?'

'জানি, একজন জানলেই হলো। আপনি তখন আসতে চাইছিলেন না কেন?'

'কী হবে ফিরে গিয়ে?'

'ফিরে গিয়ে কি হবে? সে কি? আত্মীয় স্বজন, সংসার, কত আশা, এত অল্প বয়েস......'

ভবেশ কহিল, 'ঠাট্টা করচেন?'

প্রমীলা কহিল, 'ঠাট্টা করচি নিজেকে। শুনলেন ত দিদিমার কাছে আমার গল্পটা? আমার বাঁচার অধিকার নেই, মেয়েমানুষ, কী দাম আমার? আঃ কী হাওয়া, সব একাকার

হলো, উড়ুক গায়ের কাপড়, উড়ুক মাথার চুল……সব ভেসে যাক্। কোথায় চলেছি আমরা, পথ ঠিক আছে ত?’

‘আছে, চলুন।’

জল ঠেলিতে ঠেলিতে প্রমীলা আবার বলিল, ‘চুপ করে থাক্‌বেন না, এই বেলা কথা বলে নিন, যা জিজ্ঞেস করবেন সব বল্‌ব, ষ্টেশনে পৌঁছলে আমার কথা বন্ধ হয়ে যাবে। সময় বড় কম, এই সমুদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে…… সত্যিই বল্‌চি আপনাকে, আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে! আমি আশা করিনি আপনাকে দেখতে পাবো। আপনাকে দেখতে পাবো বলেই হয়ত এত দূরে, এত দুর্য্যোগ……ঠাকুরকে ধন্যবাদ!’

ভবেশ কম্পিত কণ্ঠে কহিল, ‘আমিও তাই বল্‌চি মনে মনে।’

‘মনে মনে? চেঁচিয়ে বলুন, চীৎকার করে জানিয়ে দিন্ সবাইকে, দিদিমাকে আর মাসিকে। সবাইকে বলুন, আমাদের দেখা হবে বলেই এই চন্দ্রগ্রহণ, এই ঝড়, এই দুর্য্যোগ! আপনি আসবেন বলেই পূর্ণিমার কোটাল, জলপ্লাবন, মৃত্যু-ভয়!’

জলে দুইজনের কাপড়-চাদর ভিজিয়া সপ্ সপ্ করিতেছে। প্রমীলার মুখে-চোখে আনন্দ ও উল্লাস ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। জল ক্রমশঃ হাঁটু ছাড়াইয়া পায়ের উপর দিকে উঠিতেছিল তাহা তাহার খেয়াল নাই। দিদিমা ও মাসি কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। এই জল অতিক্রম করিয়া কেহ যে তীরে গিয়া উঠিবে এ ভরসা কাহারও ছিল না। ছুটিয়া যাইবার পথ

নয়, সাহায্য করিবার লোক নাই, সাস্ত্বনা দিবার সঙ্গী নাই— ধীরে ধীরে সমুদ্র-গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতে হইবে, নিশ্চিত [illegible]! যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও তীর নাই, মানব-চিহ্নহীন,— কেবল অশান্ত বিক্ষুব্ধ তরঙ্গরাশির কোলে তুষার-শুভ্র ফেনার উপর চন্দ্রালোক পড়িয়া পালিশ করা রূপার ফলকের মত ঝক্‌মক্ করিতেছিল।

'আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য এর রূপ।' প্রমীলা বিহ্বল হইয়া কহিল, 'এমন আকাশ-জোড়া চাঁদের আলো, এমন সমুদ্র-জোড়া তার রূপ······আমার সবচেয়ে আনন্দ, আমার মরা দেহ এর ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে যাবে। আঃ সে আমার মৃত্যু নয়, স্বর্গ!······আবার যে আপনি চুপ করলেন?'

ভবেশ কহিল, 'আমি কী বল্‌তে পারি আপনাকে? আমার আবেগ ওপর দিকে ওঠে না, ভেতরে নেমে যায়। কী কথা বলে আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই? অথচ, অথচ হয়ত বলাই উচিত ছিল···আজ যদি আমরা না বাঁচি—'

'না বাঁচি, তাই জন্যেই ঘুচে যাক্ লজ্জা, ভয়; সকল বাধা, সকল সঙ্কোচ চূরমার হোক। অন্তিম সময়ে অনর্গল কথা বলার সুবিধে পেয়েছি···শরীরের উত্তেজনা নেই, আজ মনের উত্তেজনা! কেন আপনার জড়তা, কীসের ভয়?'

ভবেশ কহিল, 'আপনি কি বল্‌তে চাইচেন।'

প্রমীলা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, সে হাসি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া বাতাসে উড়িয়া গেল। বলিল, 'ছেলেমানুষ আপনি, তাই

আমাকে সন্দেহ করছেন। আপনাকে পেয়ে আত্মহারা হয়েছি, কিন্তু কোনো মতলব নেই! আপনি অনায়াসে এখন আমাকে অপমান করতে পারেন আমি সইতে পারবো!' বলিয়া সে মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া আবার বলিল, 'অথচ আমি এমন নই। আমি সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে, বাবার নাম বললেই আপনি হয়ত চিন্‌তে পারবেন, তা এখন বল্‌ব না,—কিন্তু কী আমি। অল্প বয়সের বিধবা, অকর্ম্মণ্য, জঞ্জাল, প্রাণহীন। প্রতিদিনের অন্ন আমার অপমানের, প্রতি রাত্রের জীবন আমার আত্মগ্লানির—জানেন্ আপনি কী করে আমার দিন কাটে? ভালবাসা পাইনি, শ্রদ্ধা পাইনি, স্নেহ পাইনি, সে আমার সয়ে গেছে; কিন্তু অসহ্য লজ্জার এ জীবন, অসহ্য ব্যথার। সবচেয়ে বড় শত্রু আমার সব চেয়ে নিকট আত্মীয়রা,—থাক্ সে দুঃখের কাহিনী, বলার সময় নেই!'

তাহার অশ্রুবিগলিত কণ্ঠ অনুভব করিয়া ভবেশ একটু ব্যথা পাইল। বলিল, 'আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে আঘাত করতে চাইনি।'

প্রমীলা সে কথা শুনিল না। বলিল, 'মরেই যদি যাই, অপকলঙ্ক নিয়ে নয়, সত্যি কলঙ্ক নিয়েই যাবো! আসুন আপনি'—বলিয়া সে ভবেশের একখানা হাত লইয়া জোরে চাপিয়া ধরিল, বলিল 'আলাপ করি আপনার সঙ্গে, এই আলাপের কলঙ্ক মুখে মেখেই যদি আজ মরি……বলুন যদি আজ মরি—'

ভবেশ নিরুপায় হইয়া বলিল, 'আমি আপনাকে বুঝাতে পারচিনে।'

'সেই দুঃখই আমার রইল মরবার সময়। অথচ আমি বুঝলাম আপনাকে। সচ্চরিত্র, সাধু, নীতিবাগীশ, বলুন আপনি তা নয়?'

দুই পায়ের উরু পর্য্যন্ত জল আসিয়া ঠেকিতেছে। ভবেশ আস্তে আস্তে কহিল, 'না আমি তা নয়।'

প্রমীলা তাহার হাতটা ছাড়িল না। বলিল, 'তা নয় আপনি? আপনার নিন্দের ভয় নেই, সমাজের ভয় নেই? ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে শাস্ত্রের নাম করে যারা মানুষের গলা টিপে মারে, আপনি তাদের কাছে মাথা হেঁট করেন না?'

ভবেশ কহিল, 'এখন থেকে আর করব না!'

প্রমীলা চুপ করিয়া রহিল। ভবেশ আবার বলিল, 'আজ আমার শিক্ষা হলো, কৃতজ্ঞ রইলাম আপনার কাছে। মানুষের কথা শুনেই এসেছি এতদিন, জীবনের মুখোমুখি কেনোদিন দাঁড়াইনি।'

'এখন কোথা যাবেন?'

ভবেশ তাহা বলিতে পারিল না, ছপ্ ছপ্ করিয়া জল ঠেলিয়া প্রমীলার পাশে পাশে চলিতে লাগিল। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আসিলে দূরে আলো দেখিতে পাইল। আলো দেখিয়া উভয়ে আনন্দ বিস্ময়ে সেইদিকে তাকাইল। ষ্টেশন দেখা গিয়াছে।

'বলুন এখন কোথা যাবেন ?'

'কোথাও যাওয়া হবে না ।'

'কেন, এই যে তখন স্বীকার হলেন যে—?'

ভবেশ কহিল, 'তবে খুলেই বলি। যাবার সঙ্গতি আমার নেই টাকাকড়ি আমার সব চুরি হয়ে গেছে ।'

প্রমীলা কহিল, 'হাজার হলেও আমাদের সঙ্গে আপনাকে যেতে হবে। তা ছাড়া আমিই বা আপনাকে ফেলে কেমন করে যাবো ? পুরী পর্য্যন্ত অন্ততঃ একসঙ্গে যাওয়া চাই ।'

'পুরী পর্য্যন্ত ? দেশের দিকে ফেরার ইচ্ছে কিন্তু এখন আমার ছিল না !'

দূরে বোধ করি দিদিমার ছায়া দেখা যাইতেছিল। ভাল করিয়া কথা বলিবার সময় আর হয়ত পাওয়া যাইবে না। প্রমীলা তাড়াতাড়ি বলিল, 'সে হবে না, কিছুতেই না, যেতেই হবে আমাদের সঙ্গে, যেতেই হবে তোমাকে।' বলিয়া সে ভবেশের হাতখানা আবার চাপিয়া ধরিল।

ভবেশ দিশাহারা হইয়া গেল। এই অল্প সময়ের মধ্যে এমন গভীর করিয়া জীবনে কেহই তাহাকে কাছে টানিয়া লয় নাই। এই নিবিড় মমতার স্পর্শ তাহাকে সব ভুলাইয়া দিল। বলিল, 'কেমন করে যাবো ?'

'সে ভার আমার।' বলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে কোমরের কাপড়ের ভিতর হইতে অন্ধকারে কয়েকখানি নোট বাহির করিয়া সে ভবেশের হাতে গুঁজিয়া দিল। পুনরায় কহিল, 'এ টাকা আমার

কাছে যে ছিল ওরা কেউ জানে না। আমার জন্যে ভেবো না ঠিক চলে যাবে। আর শোনো, ওদের সঙ্গে দেখা হলে তুমি থাকবে পিছিয়ে, যেন কিছু বুঝতে না পারে, জানো ত এদেশের মেয়েমানুষের বন্ধু থাকতে নেই!' বলিয়া ভবেশকে ছাড়িয়া সে দ্রুতপদে চলিতে লাগিল।

ভবেশ সত্যই পিছাইয়া রহিল এবং এতটুকু সময়ের মধ্যে তাহার সমস্ত কিছু চূরমার করিয়া যে রহস্যময়ী তাহাকে এমন করিয়া মুগ্ধ করিয়া গেল তাহার মুখখানি এই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সমুদ্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া একবার ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল কিন্তু তাহা আর হইল না, তাহার সর্ব্বশরীর কি এক ব্যাকুল আনন্দে থর থর করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে ভোর হইয়া আসিল, চন্দ্রালোক নিস্প্রভ হইতে লাগিল, ভবেশ চাহিয়া দেখিল, জল ভাঙিতে ভাঙিতে গিয়া প্রমীলা দিদিমা ও মাসিমার সহিত মিলিত হইয়াছে। সে ইচ্ছা করিয়াই পিছাইয়া পড়িয়াছিল, অনেক দূর হইতে ধীরে ধীরে গিয়া সে তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভিজা কাপড়ে মাসি ও দিদিমা দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, 'এসো ভাই এসো, অনেক পিছিয়ে পড়েছিলে বুঝি? দুর্গা নামের জোরেই আমরা এ যাত্রা বেঁচে গেলাম। বুড়ো মানুষ, আর চল্‌তে পাচ্ছিনে, পা ভারি হয়ে গেছে।'

ভবেশ কহিল, 'ষ্টেশনে চলুন, গাড়ী ছাড়তে আর বিলম্ব নেই।'

ভিজা কাপড়ে হাওয়া লাগিয়া সকলেরই শীত ধরিয়াছে।

চার জনে মিলিয়া বাকি পথটুকু পার হইয়া ষ্টেশনে আসিল মাসি ও দিদিমার কাছে কাপড়ের পুঁটলি ছিল। প্রমীলা কহিল, 'এত করে বল্‌লাম দিদিমাকে, পুঁটলিটা আমার হাতে দাও, দিলে না। আন্‌তে খুব কষ্ট হলো ত ?'

'তা হোক' দিদিমা কহিলেন, 'তুমি ভাই বড়লোক, তোমার পুঁটলি বয়ে বেড়ানো অভ্যেস নেই!'

মাসি ভবেশের দিকে তাকাইয়া কহিল, 'বেশ করেছ বাবা, মেয়েটার সঙ্গে সঙ্গে এসেছ, আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম।'

মাসির মনের কথা প্রমীলা জানে। তাই প্রতিবাদ করিয়া বলিল, 'তা ত নয় মাসি, আমি একলাই এসেচি, উনি কোথায় ছিলেন আমি দেখিনি।'

মাসি কহিল, 'বেশ ত, ভালই ত, আমি মনে করি বুঝি—'

প্রমীলা গম্ভীর হইয়া বলিল, 'মনে তুমি এমন আর করো না।'

ওয়েটিং-রুমে গিয়া ভিজা কাপড় ছাড়িয়া পরিষ্কার সাদা থান পরিয়া মাসি ও দিদিমা বাহির হইয়া আসিলেন। প্রমীলা একখানি চওড়া পাড় সাড়ী পরিয়া সোজা গিয়া ট্রেণের কামরায় উঠিয়া বসিল।

দেখিতে দেখিতে ট্রেণের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, দূর হইতে প্রমীলার ইঙ্গিত পাইয়া যন্ত্রচালিতের মত একখানা টিকিট করিয়া মাসি ও দিদিমার পিছনে পিছনে ভবেশও গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল।

দিদিমা কহিলেন, 'বাঁচলাম বাবা তোমাকে পেয়ে। পুরুষ মানুষ একজন সঙ্গে না থাকলে পথে ভারি কষ্ট, মা দুর্গা তোমাকে মিলিয়ে দিয়েচেন।'

মাসি কহিল, 'এটা মেয়েদের গাড়ী না ?'

ভবেশ কহিল, 'না, এটা পুরুষের।'

'আমরা না হয় মেয়েদের গাড়ীতেই যাই।'

'তাই চল দিদিমা।' প্রমীলা বলিয়া উঠিল।

দিদিমা কহিলেন, 'থাক্ ভাই, বুড়ো মানুষ আর পারিনে।'

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। প্রমীলা এক সময় অলক্ষ্যে ইসারা করিয়া ভবেশকে পিছনের সিট্‌এ গিয়া বসিতে বলিল। ভবেশ তাহার হুকুম পালন করিল।

কিন্তু দুইজনে এমন করিয়াই বসিল যাহাতে, কেহ বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু নিঃশব্দে পরস্পরের কথাবার্ত্তা চলিতে পারে। প্রমীলা সকৌতুকে একটুখানি হাসিল, এবং সে হাসিটুকু মিলাইয়া দিল দিদিমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া। প্রভাত-সূর্য্যের রক্তরাগ তাহার মুখে-চোখে গায়ের কাপড়ে এবং মাথার শুষ্ক চুলগুলিতে আসিয়া পড়িয়াছে। দুইটি নিবিড় ও গভীর তাহার চক্ষুতারকা, নধর নিটোল দেহলতা, সমস্ত মুখ-খানিতে বুদ্ধির দীপ্তি এবং তাহার সহিত পরিণত যৌবনের গাম্ভীর্য্য, সুন্দর দুইখানি হাতে দু'গাছি সোণার বালা। নিমেষমাত্র তাহার দিকে তাকাইয়া মুখ ফিরাইয়া ভবেশ বসিয়া রহিল। চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া ইহার সহিত চোখোচোখি

ও ইসারা-ইঙ্গিত করিতে তাঁহার মন উঠিল না। নারীর সহিত তাহার যে কোনো সম্পর্কই হউক, শ্রদ্ধা না করিয়া সে থাকিতে পারে না।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গাড়ী আসিয়া রামেশ্বরমে পৌঁছিল। নামিবার সময় সুবিধা পাইয়া প্রমীলা চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, 'শরীর ভাল আছে ত ?'

ভবেশ কহিল, 'হুঁ।'

তাহার হাতটা ছুঁইয়া প্রমীলা নামিয়া পড়িল। বলিল, 'দিদিমা, আমাদের ধর্ম্মশালাটা কোন্ দিকে মনে আছে ত ?'

'খুঁজে নেবো ভাই, আয়। ও ভাই ভবেশ, আমাদের গাড়ী আবার ক'টায় ? এখানে আমাদের থাকার আর দরকার নেই, কেমন করে বলি, বাবার মন্দিরের কাজ আমাদের এক রকম—'

'বল্‌তে আর কী বাকী রাখলে দিদিমা ?' প্রমীলা হাসিয়া বলিল।

ভবেশ কহিল, 'মাদ্রাজের গাড়ী আবার বেলা চারটেয়, সেই গাড়ীতেই যাওয়া সুবিধে।'

'তাই যাবো।' চলিতে চলিতে দিদিমা বলিলেন, 'তুমি কোন্ বাসায় আছো বাবা, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কী হবে ?'

'যা হোক করে চলে যাবে, একটা বেলা বৈ ত নয়।'

'তোমার জিনিস-পত্তর ?'

ভবেশ কহিল, 'বিশেষ কিছুই আমি আনিনি। যা এনেছিলাম তাও হারিয়ে গেছে।'

প্রমীলা এবার সকলের সম্মুখেই জিজ্ঞাসা করিল, 'হারিয়ে গেছে? চুরি হয়েছিল বুঝি?'

ভবেশ সবিনয়ে মাথা হেঁট করিয়া কহিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

তাহার বিনীত উক্তি ও জড়িত সঙ্কোচ দেখিয়া মাসির সন্দেহ কিয়ৎ পরিমাণে কমিয়া গেল। মেয়েটার সহিত তাহ' হইলে ভবেশের বিশেষ মাখামাখি হয় নাই! খুসি হইয়া মাসি কহিল, 'তবে তোমার আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই বাবা, আমাদের ওখানেই একসঙ্গে রান্না হবে, খাওয়া দাওয়া করে সবাই মিলে গাড়ীতে উঠ্‌বো।'

প্রমীলা তাহার আনন্দ চাপিয়া রাখিয়া কহিল, 'সে কি উচিত? মাসির এক কথা, তীর্থস্থানে এসে উনি তোমাদের প্রতিগ্রহ করবেন কেন? তা ছাড়া আমাদের ওখানে জায়গাই বা কোথায়?'

মাসি কহিল, 'তুই বলিস কি লা? অত বড় ধর্ম্মশালায় জায়গা নেই? মানুষের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে শেখ্‌! তা ছাড়া দিদিমা আর মাসি, ছেলে যদি তাদের কাছে খায় তাকে প্রতিগ্রহ বলে না।'

ভবেশ নানা আপত্তি তুলিয়া বলিল, 'উনি ঠিকই বলেচেন. আমাকে যেতেই দিন, ঠিক সময় ষ্টেশনে বরং আমি আপনাদের সঙ্গে—'

সে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেই দিদিমা খপ্ করিয়া তাহার একখানা হাত ধরিয়া ফেলিলেন। হাসিয়া বলিলেন, 'পাগল ছেলে, ও মেয়েকে তুমি এখনও চিন্‌তে পারোনি ভাই······ও অমনিই বেমক্কা, চিরকাল! আমাদের ছেড়ে এক পা তোমার কোথাও যাওয়া হবে না ভাই, এসো।'

অগত্যা ভবেশকে সঙ্গে সঙ্গেই যাইতে হইল। দিদিমা ও মাসিতে মিলিয়া প্রমীলাকে তাহার এই রূঢ়তার জন্য তিরস্কার করিতে করিতে চলিলেন। তখন সে ঘোর উদাসীন ও নির্লিপ্ত। অলক্ষ্যে একবার ভবেশের দিকে তাকাইয়া সে যে চাপা হাসি হাসিতেছিল, তাহা ধরিয়া ফেলিবার সাধ্য স্বয়ং রামেশ্বর মহাদেবেরও ছিল না।

বাসায় পৌঁছিয়া রান্না বান্না হইতেছিল। কূয়া হইতে জল আনিতে গিয়া আবার নিভৃতে দুইজনের দেখা হইয়া গেল। দেখা হইবার সুযোগ প্রমীলা আবিষ্কার করিতেছিল।

'পুরী থেকে কোথায় যাবে?'

ভবেশ কহিল, 'কল্‌কাতায়।'

'আমি যাবো লক্ষ্ণৌ। কলকাতার ঠিকানাটা দিয়ে যেও।'

ভবেশ কহিল, 'তোমরা কি লক্ষ্ণৌতেই থাকো?'

'হ্যাঁ। ওখান থেকে লিখবো আবার কোথায় দেখা হবে। ভুলে যাবে না ত?'

তাহার আয়ত দুইটি চক্ষুর দিকে তাকাইয়া ভবেশ কহিল, 'ভুলে যাওয়া কি এতই সহজ? তাছাড়া যে উপকার পেলাম—'

'হ্যাঁ কৃতজ্ঞ থেকো' বলিয়া জল লইয়া প্রমীলা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে কোথা হইতে সে আবার আসিয়া হাজির হইল। একখানা ধোপদস্ত কাপড় ঝুপ্‌ করিয়া ভবেশের গায়ের উপর ফেলিয়া দিয়া কহিল, 'চওড়া পাড় ছিঁড়ে সরু করে দিয়েছি, কেউ বুঝতে পারবে না, জিজ্ঞেস করলে বলো, পাণ্ডা দিয়েছে,—নেয়ে এসো, রান্না হয়েছে।'

দ্রুতপদে আবার সে চলিয়া গেল।

আহারাদি এবং সামান্য বিশ্রাম করিয়া যথাসময়ে সকলে ষ্টেশনে আসিয়া মাদ্রাজের গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। জিনিস-পত্র, লটবহর অনেক। ভবেশ তদ্বির করিয়া একে একে গাড়ীতে উঠাইয়া দিল। একটা ছোট ক্যাম্বিশের ব্যাগে প্রমীলার নাম লেখা, সেটি হাতে করিয়া সকলের পিছনে সে গাড়ীতে উঠিতেছিল, প্রমীলা সরিয়া আসিয়া তাহার হাত হইতে ব্যাগটা লইল, এবং লইবার সময় সে ভবেশের কয়েকটা আঙুলের উপর একটু চাপ দিল। পুরাকালের বৃদ্ধারা অল্প-বয়সে যখন অপরিচিত পুরুষের প্রতি আসক্ত হইতেন, তখন আজকালকার যুবক-যুবতীগণের মত পরস্পরের দেহ স্পর্শ করিবার আধুনিক ছলা-কৌশলগুলি তাঁহাদের জানা ছিল না, জানিবার কথাও নয়; এখনকার ছেলেমেয়েরা এ সম্বন্ধে অনেক বুদ্ধির খেলা খেলিতে পারে। ভবেশ নিঃশব্দে প্রমীলার দিকে তাকাইয়া হাসিয়া ফেলিল।

কথা কহিবার সুযোগ আরার এক সময় মিলিয়া গেল। প্রমীলা কহিল, 'রাত্রে যেন গাড়ীতে ঠাণ্ডা লাগে না, যে বেহুঁস মানুষ তুমি।'

'ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করলেই খুসী হই। তোমার সেবা—

'দুষ্টু কোথাকার! সে ভাগ্যি কি আর করেছি যে দু'দণ্ড বসে,—আমার মাথার দিব্যি রইল, সাবধানে যেও।'

গাড়ী ছাড়িতেই প্ল্যাট্‌ফরমের উপর হইতে ভবেশ গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল।

একই পথ দিয়া ফিরিতে হইল। যাত্রা ভঙ্গ করিতে করিতে মাদ্রাজ, ওয়াল্‌-টেয়ার এবং রাজামন্দিরি পার হইয়া তাহারা যখন পুরীর গাড়ী ধরিল তখন ছয়টি দিন অতিক্রম করিয়াছে। ছয়টি দিন সুখস্বপ্নের মত চলিয়া গিয়াছে। সামান্য কয়টি দিবসের বিচিত্র ইতিহাস। শহরে বনে পর্ব্বতে নদীতীরে, বিশেষ করিয়া সেদিন মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে গোদাবরীর তীরে শস্য-ক্ষেতের ধারে চলিতে চলিতে সুন্দর কথালাপের কথা ভবেশ চিরদিন স্মরণ করিবে। আলাপ হইতেও তাহাদের যেমন বেশি সময় লাগে নাই, অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছেও তেমনি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে। সত্যকারের বন্ধুত্বের যেখানে সম্ভাবনা, সেখানে সময়ের অপেক্ষা নাই।

এই নারীটি অল্প সময়ের মধ্যে তাহার হৃদয়ের সকল দিক প্লাবিত করিয়া দিয়াছে; প্রাচুর্য্যময়ী নারী, প্রাণময়ী, স্নেহ-সুশীতল,—অথচ কোথাও তাহার ফাঁকি নাই। ভিতরে সে সাগরের মত আবেগ-উচ্ছল, বাহিরে আকাশের মত প্রশান্ত ও গম্ভীর। নিরালায় একাকী পাইয়া সে যেমন চঞ্চল এবং মুখর হইয়া উঠে, সকলের সম্মুখে সে তেমনি উদাসীন, নির্লিপ্ত, সংযমের কঠিন বৈরাগ্যে সে তপস্বিনী। অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় সুন্দরী সে নয়, অথচ কোথায় যেন তার বিস্ময়কর লাবণ্য, দেহ ছাড়াইয়া দেহাতীত বস্তুকে সে প্রকাশ করে, ভাষা এবং ছন্দকে অতিক্রম করিয়া কাব্যের ব্যঞ্জনা, ফুল অতিক্রম করিয়া গন্ধ, রূপের ওপারে রস। সর্ব্বাঙ্গে তাহার অযত্ন, অবহেলা—দেহের

প্রতি স্বাভাবিক তাচ্ছিল্য, নিজেকে মনোহর করিয়া প্রকাশ করিতে সে ঘৃণা করে। তাহার অনুরাগের মধ্যে দেহ-লালসাই একমাত্র নয়, দেহের পিছনে আছে তাহার মন, সে মন ঐশ্বর্য্য-ময়। অবৈধ আসক্তির আত্মগ্লানিতে সে থমকিয়া দাঁড়ায় না; একবার অগ্রসর হইয়া দুইবার পিছাইয়া যাওয়া তাহার চরিত্র নয়, অন্তরে সে দ্বন্দ্বহীন দ্বিধাহীন, সে স্পষ্ট, জাগ্রত এবং সচেতন। তাহার আত্মীয়তা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, অতিরিক্ত পরিচিত, সে যেন তাহার নিকটতম আত্মীয়কে বহুদিন পরে ফিরিয়া পাইয়াছে, তপস্যার পরে সিদ্ধিলাভ। জীবনের প্রতিদিবসের অন্তরঙ্গ পাওয়া!

আজ সমস্ত দিন ধরিয়া দুইজনের মনে মনে একটি বিচ্ছেদের ব্যথা টন্ টন্ করিতেছিল। কাল প্রাতে পুরীতে পৌঁছিয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য তাহাদের ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইবে। ছাড়াছাড়ি যে হইবেই এ কথা আজই তাহাদের মনে হইয়াছে। সমস্ত দিন তাহাদের উৎসাহ নাই, একটি করুণ অবসাদ, অশ্রুময় আলস্য। পথ প্রায় ফুরাইয়াছে, গৃহগত মন, বৈচিত্র্যহীন দিন-যাপনের চিন্তা, নিরানন্দ প্রতিদিবসের বোঝা—চারিদিক্ দিয়া যেন ঘিরিয়া ধরিতেছে।

পরিচিত ষ্টেশনগুলি একে একে পার হইয়া যাইতেছিল। প্রমীলা জানালার বাহিরে তাকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

প্রান্তরের উপর দিয়া সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিল, দিক্-চিহ্নহীন সে অন্ধকার, কোথাও কোথাও স্তিমিত প্রদীপ জ্বলিয়া

উঠিয়া গ্রামের অস্তিত্বের কথা জানাইল, কত যাত্রী উঠিল, কত যাত্রী পথে চলিয়া গেল, গাড়ীর ভিতরে কল-কোলাহল, ট্রেণের চাকার আর্ত্তনাদ, বাঁশীর শব্দ—তাহাদেরই একান্তে বসিয়া নিমীলিত দৃষ্টিতে প্রমীলা চাহিয়া রহিল। দক্ষিণ দিকে এতদিন ঠাণ্ডা ছিল না, আজ সকাল হইতে একটু একটু করিয়া শীতের হাওয়া লাগিতেছিল। বাহিরে কৃষ্ণপক্ষের কালো আকাশ, অল্প কুয়াসাচ্ছন্ন; নক্ষত্রগুলি নিষ্প্রভ বিলীয়মান।

একটা ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইতেই ভবেশ নামিল। টিম্ টিম্ করিয়া দুই একটা আলো প্লাট্‌ফরমের উপর জ্বলিতেছে। জানালার কাছে একটু সরিয়া আসিয়া সে প্রমীলার হাতের উপর একখানা হাত রাখিল। চুপি চুপি বলিল, 'আজকের রাতটা, কাল থেকে আর দেখাশুনো নেই, কোথায় যে চলে যাবো তার আর ঠিক থাকবে না।'

প্রমীলা তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

'কথা বল, চুপ করে থেকো না প্রমীলা, কথা বলে যাও। তুমি জানো না, তুমি আমার সব চূরমার করে দিয়েছ। তোমায় পাওয়া আমার কতখানি, তুমি জানো না—'

প্রমীলা কথা বলিল না, শুধু হাত বাড়াইয়া ভবেশের মাথার চুলগুলি গুছাইয়া দিতে লাগিল।

'ঠিকানাটা হারিও না যেন প্রমীলা!'

প্রমীলা কহিল, 'হারিয়ে গেলেও ক্ষতি নেই, মুখস্থ করে রেখেছি।'

'তোমরা কল্‌কাতা হয়ে যাবে ?'

'বোধ হয় না। খড়গপুর আর গোমো হয়ে লক্ষ্ণৌ যাবো।'

'আজ থেকে ঠিক সাত দিনের দিন চিঠি পাবো ত ?'

'নিশ্চয়, যদি-না চিঠি পথে মারা যায়।'

'আশ্চর্য্য প্রমীলা !' বলিয়া ভবেশ কিয়ৎক্ষণ থামিল, তারপর বলিল, 'এখন তুমি এত নিকটে, এবার থেকে তোমার চিঠির অপেক্ষায় আমাকে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে। আবার কবে তোমায় দেখতে পাবো প্রমীলা, বলে যাও।'

পিছন হইতে দিদিমার সাড়া পাইয়া প্রমীলা চোখ টিপিয়া ভবেশকে সরাইয়া দিল।

সমস্ত দিনের ক্লান্তি, একটিবার মাত্র সাড়া দিয়া গাড়ীর দোলায় দিদিমার আবার তন্দ্রা আসিল। মাসি মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছিল।

ওদিকে এতদিন ভাল চা পাওয়া যায় নাই, একজন ফিরিওয়ালার নিকট চা দেখিয়া প্রমীলা ইঙ্গিতে ভবেশকে কিনিতে বলিল। চা কিনিয়া ভবেশ তাহার হাতে দিতে গেলে সে কহিল, 'তুমি খাও' বলিয়া আঁচল খুলিয়া সে পয়সা বাহির করিয়া ফিরিওয়ালার হাতে দিল।

ভবেশ আবার সরিয়া আসিয়া একখানা হাত তাহার হাতের উপর তুলিয়া দিয়া চা খাইতে লাগিল। খানিকটা খাইবার পর প্রমীলা লুকাইয়া তাহার হাত হইতে পেয়ালাটা

লইয়া এক চুমুক খাইয়া আবার ফিরাইয়া দিল। বলিল, 'এর পরের ষ্টেশনে খাবার কিনো, সেই কখন্ খেয়েছ।'

ভবেশ কহিল, 'আচ্ছা।' একটু থামিয়া আবার কহিল, "তুমি যে টাকা আমায় দিয়েছ, অত আমার দরকারে লাগবে না; তোমার যদি পথে অসুবিধে হয়……কিছু টাকা তুমি সঙ্গে রাখো প্রমীলা!'

প্রমীলা কহিল, 'সঙ্গে আমার আছে। অর্দ্ধেক টাকা দিয়েচি তোমাকে। আমার সুবিধে এই যে, কাউকে হিসেব দিতে হবে না।'

'কেন?'

'এসব আমার সম্পূর্ণ নিজের। আমার কাছে কী থাকে না থাকে জানবার উপায় নেই। যাক্ এসব বাজে কথা।—এতদিন একসঙ্গে রইলাম, তোমার কথা কিছু শুনলাম না। তোমার মা আছেন?'

'আছেন।'

'তাঁকে সঙ্গে আনোনি কেন?'

'তাঁকে আনলে হয়ত তোমাকে পেতাম না!' বলিয়া ভবেশ হাসিল!

প্রমীলা কহিল, 'এই বয়েসে এত পুণ্য করবার সখ হলো যে?'

হাসিমুখে ভবেশ বলিল, 'তোমার চেয়ে ত আমি কম পাপী নই!'

হাসিয়াই প্রমীলা তাহার কথার উত্তর দিল। বলিল, 'বুঝলাম পাপ আমি জীবনে করিনি, করলে তোমার দেখা পেতাম না।' বলিয়া গাড়ীর ভিতর হইতেই ভবেশের গলার উপর উষ্ণ হাতখানি রাখিয়া তাহাকে নিবিড়ভাবে সে অনুভব করিতে লাগিল।

হাসিমুখেরই কথা, কিন্তু শেষটুকু বলিতে গিয়া প্রমীলার কণ্ঠ যে আবেগে কাঁপিয়া উঠিল, বিচ্ছেদ-বেদনার যে কারুণ্য ফুটিল, মনে হইল নারীর ভালবাসার কাছে জগতের আর সমস্তই মিথ্যা, অর্থহীন। এই অন্ধকার রাত্রি, এই রেলপথ, দূরে ওই আলো, ষ্টেশনের গোলমাল—অথচ কোন্‌দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া ভবেশ কী যে দেখিতে লাগিল তাহা নিজেই সে বুঝিতে পারিল না। সামান্য পরিচয়ের পর নারীর নিকট হইতে প্রথম আন্তরিক প্রেম-নিবেদন যাহারা পাইয়াছে, তাহারা জানে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস-সাহিত্যও তাহার কাছে কত তুচ্ছ, কত মলিন! প্রমীলার একখানি হাত জড়াইয়া ধরিয়া সে যখন নির্ব্বাক বিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তখন অগণ্য নক্ষত্র কোলে লইয়া আকাশ আনন্দে কাঁপিতেছে, বাতাস নিশ্চল হইয়া তাহার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনিতেছে, সমস্ত ষ্টেশন জুড়িয়া সবাই যেন গান ধরিয়াছে! সে বুঝিতে পারিল না, এ কী, বেদনার বিহ্বলতা, কিংবা উল্লাসের তরঙ্গভঙ্গ,—এ কি তাহার পরমায়ুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্ত, জীবনের প্রথম মহোৎসবের লগ্ন?

বাঁশী বাজিয়া চমক ভাঙিতেই সে হাসিয়া উঠিল। তীক্ষ্ণ, তীব্র, জ্বলন্ত হাসি,—পাগলের মত সে হাসিল, সৃষ্টিতত্ত্বের গোপনতম রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিতে পারিয়া সে যেন হাসিয়া উঠিয়াছে, সে হাসি যেন অমৃত লাভ করিয়া মৃত্যুকে উপহাস করিতেছে, সে যেন বিধাতার দেখা পাইয়াছে! হাসিয়া সে সরিয়া গেল, ছুটিয়া বেড়াইল, ঘুরিতে লাগিল, টলিতে টলিতে দাঁড়াইল। চোখ তাহার বুজিয়া আসিতেছে, আর সে চোখ খুলিবে না, অন্ধ হইয়া যাক্, অনন্ত শূন্যে সে ছুটিয়া চলুক, গ্রহে গ্রহে তারায় তারায়, বিশ্বের সকল কোণে সে এই আনন্দ-সংবাদ পৌঁছিয়া দিক্, চীৎকার করুক, কাঁদুক, আপনাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া দিক্।

'পাগল পাগল, তুমি পাগল হয়ে গেছ প্রমীলা, তুমি—'

'এসো উঠে এসো, গাড়ী যে ছেড়ে দিয়েছে!'

প্রমীলা ব্যস্ত হইয়া উঠিতেই ভবেশ আর কোনোদিকে না চাহিয়া লাফাইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

গভীর রাত্রি। গম্ গম্ করিয়া ট্রেণ ছুটিতেছে। পিঠের দিকে পাশের বেঞ্চিতে ভবেশ চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিল। জাগিয়া আছে কি ঘুমাইতেছে তাহা বুঝা গেল না। মাঝে মাঝে বাহিরের বাতাসে তাহার মাথার চুলগুলি উড়িতেছিল।

দিদিমার নাক ডাকিতেছে, মাসি জাগিয়া উঠিয়া খানিকক্ষণ বসিয়াছিল এবং যখন দেখিল প্রমীলা জানালায় মাথা হেলাইয়া অকাতরে ঘুমাইতেছে, তখন সে আঁচলে বাঁধা মিষ্টান্ন বাহির

করিয়া গালে দিয়া জল খাইয়া আবার মুড়ি দিয়া শুইল। মাসির ঝক্কি নাই।

নিতান্তই সে যখন আবার ঘুমাইল তখন প্রমীলা আবার চোখ চাহিল; যে কাজটা সে এতক্ষণ সারিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল, তাহা এইবার তাহার পক্ষে সহজ হইল। আস্তে আস্তে ব্যাগের ভিতর হইতে একখানি দামী শাল বাহির করিয়া অতি যত্নে ভবেশের গায়ের উপর ছড়াইয়া দিল, এবং একখানা চাদর পাট করিয়া বালিশের মত তাহার মাথার তলায় ধীরে ধীরে গুঁজিয়া দিয়া হাত সরাইয়া লইল। ওধারে একজন উড়িয়া স্ত্রীলোক তাহার এই ভাবভঙ্গীর দিকে একদৃষ্টে লক্ষ্য করিতেছিল। গুলী করিয়া তাহাকে মারিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু প্রমীলা তাহাকে গ্রাহ্যই করিল না, নিজের কাজ করিয়া সে আবার বসিয়া রহিল।

এই রাত্রি সে জাগিয়া কাটাইবে, কাটাইতেই হইবে, ঘুমাইলে তাহার এই সুখরাত্রি হইবে ব্যর্থ, এ রাত্রি অজ্ঞানে সে পোহাইতে দিবে না; নাড়ীতে নাড়ীতে তাহার রক্ত-প্রবাহের কলধ্বনি, দেহে দেহে রোমাঞ্চ, চোখে নিবিড় যৌবনের নেশা, বুকের মধ্যে অধীর ভালবাসার ব্যাকুলতা—এ রাত্রি সে জাগিয়াই থাকিবে। এই কয়দিন ধরিয়া কত যুদ্ধই সে করিল। সংস্কারের বাধা, শুচিতার বাধা, নীতির বাধা—বাধা তাহার অনেক। জনসমাজের চক্ষে বিধবার সম্বন্ধে এত বড় অবৈধ কাজ আর কিছু নাই,

এত বড় অন্যায়, এত বড় পাপ! এ যে পাপ, এ কথাই সে জানিয়া আসিয়াছে।

সমস্ত গাড়ীখানা দ্রুতগতির দোলায় দুলিতেছিল। আলো দুলিতেছে, জিনিসপত্র পোঁট্‌লা পুঁটুলি দুলিতেছে, নিদ্রিত যাত্রীরা দুলিতেছে, বাহিরে দুলিতেছে আকাশ, দুলিতেছে অন্ধকার, দুলিতেছে অগণ্য নক্ষত্র। আর সে? সেও দুলিতেছে, তাহার চঞ্চল রক্তে লাগিতেছে দোলা, দুলিতেছে চোখের দুইটি তারকা, দুলিতেছে ইহকাল ও পরকাল। প্রমীলার কান্না পাইল, কাঁদিতে গিয়া সে হাসিয়া ফেলিল। নিমীলিত নেত্রে বসিয়া বসিয়া একখানি হাত সস্নেহে সে ভবেশের মুখের উপর প্রসারিত করিয়া অতি আদরে বুলাইতে লাগিল। বুলাইতে বুলাইতে কখন্ এক সময়ে নিজের হাতখানাই তাহার থামিয়া গেল। বড় বড় চোখে চাহিয়া নিজের হাতের আঙুলগুলির দিকে সে তাকাইল।

মাথাটা তাহার ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। আস্তে আস্তে ওপাশে মুখ হেঁট করিয়া অতি মৃদু কণ্ঠে কহিল, 'ওকি, পুরুষ মানুষের চোখে জল কেন?'—হাত দিয়াই সে ভবেশের চোখ মুছিয়া দিল।

চোখ খুলিয়া ভবেশ তাহার দিকে তাকাইল, দেখিল অশ্রুর ফোঁটায় প্রমীলার দুইটি চক্ষুও ততক্ষণে পরিপূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। দুইজনেই হাসিল। তারপর তাহার হাতখানি লইয়া গভীর আবেগে চুম্বন করিয়া মুখে চোখে বুকে চাপিয়া

নিতান্ত শিশুর মত ভবেশ কহিল, 'আজকের রাত যেন আর না পোয়ায় প্রমীলা!' বলিয়া সে প্রমীলার ঠিক কাঁধের পাশেই উঠিয়া বসিল!

তাহারা যেন চুরি-ডাকাতি করিতেছিল, এত সন্ত্রস্ত, এত সতর্ক। অত্যন্ত চুপি চুপি তাহারা গুছাইয়া বসিয়া গল্প করিতে যাইবে, এমন সময় পায়ের দিকে একজন যাত্রী ঘুম ছাড়াইয়া উঠিয়া বসিল,—তাহাদের দিকে তাকাইল না বটে কিন্তু জাগিয়াই রহিল। গল্প করা আর হইল না, সেই দুঃখে বাঁ হাতে ভবেশ তাহার গলাটা জড়াইল, প্রমীলাও তাহার নিঃশ্বাসের কাছাকাছি মুখ আনিল, কিন্তু এত করিয়াও তাহারা আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিল:না, মাসির সাড়া পাইয়া দ্রুত ভবেশ শুইয়া পড়িল এবং প্রমীলা গা এলাইয়া দিয়া চোখ বুজিয়া গাড়ীর দোলায় দুলিতে লাগিল। নিদ্রায় তাহার দেহ যেন একেবারে অচেতন!

মাসির মত মানুষ শেষরাত্রে আর ঘুমাইতে পারে না, উঠিয়া বসিয়া আস্তে আস্তে হরিনাম করিতে লাগিল। একটু পরেই তাহার গলার আওয়াজ পাইয়া দিদিমারও ঘুম ভাঙিয়া গেল, তিনিও ঘুম ছাড়াইয়া উঠিয়া বসিলেন।

'কী মেয়ে মা, সারারাত বসে বসেই ঘুমুলো! কেন, এই ত এত জায়গা ছিল, স্বচ্ছন্দে—ওরে ও মীলা!'

প্রমীলার তখন নাক ডাকিতেছে।

মাসি একেবারে তাহার গা ঠেলিয়াই ডাকিয়া দিল।

বলিল, 'ভাল হয়ে বসো মা···মেয়েমানুষ ; বলি শালখানার কি অবস্থা হয়েছে ছাখ্ ত, এত দামের শাল, এধারে খানিকটা ঝুলচে, ওধারে খানিকটা লুটোপুটি······তোমার যদি কিছুতে যত্ন আছে!'

প্রমীলা চোখ চাহিল, এবং চাহিয়াই রহিল মাসির দিকে। চোখ দুইটি তাহার রাঙা। শালখানি তাহাকে দুইদিক্ হইতেই টানিয়া গুছাইয়া লইতে হইল।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি পোহাইল, গাড়ীর ভিতরের আলো-গুলি নিষ্প্রভ হইয়া আসিল, কৃষ্ণপক্ষের পাণ্ডুর চন্দ্র আর উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারিল না, পূর্ব্বদিকের আকাশ ফর্শা হইতে লাগিল।

খুর্দ্দা রোড হইয়া পুরী ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিল।

এবারের মত নাটকের হইল যবনিকা পতন। বিদায়ের পালা। অবসাদগ্রস্ত দেহ, অবসন্ন যাত্রা। গাড়ী হইতে নামিবার সময় অবকাশ পাইয়া প্রমীলা কহিল, 'কল্‌কাতা পর্য্যন্ত যাবে, সঙ্গে কিছু নেই, শীতে কষ্ট হবে ত ?'

'আর কষ্ট গায়ে লাগবে না।' ভবেশ কহিল, 'চিঠি দিও ঠিক সময়ে।'

'এখানে কোথায় উঠ্‌বে ?'

'ধর্ম্মশালায়। আজই রাতে আবার গাড়ীতে উঠ্‌বো।'

ষ্টেশনের গোলমালের মধ্যে সবাই নামিয়া আসিল। কুলির মাথায় ভবেশ তাঁহাদের মালপত্র উঠাইয়া দিল। বাহিরের গাড়োয়ানরা আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল।

অনেক আশীর্ব্বাদ এবং বহু কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশ করিয়া দিদিমা আসিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিলেন। ভবেশ ভাড়া করিল একখানা গরুর গাড়ী, সে আর সঙ্গে যাইবে না, কোনো দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে দুইজনের সম্পর্ক ধরা পড়িয়া গেলেই একটা কেলেঙ্কারী। কিন্তু মাসিও যখন নিতান্তই গাড়ীতে গিয়া উঠিল তখন হঠাৎ প্রমীলা দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া অলক্ষ্যে তাহার শালখানা ঝুপ্‌ করিয়া ভবেশের গাড়ীর মধ্যে ফেলিয়া দিল, এবং আর কোনোদিকে তাকাইল না; গাড়ীতে উঠিয়া মাসির গলা জড়াইয়া চুমো খাইয়া আদর করিয়া হাসিয়া কহিল, 'তবে আমরা বাড়ীর কাছাকাছি এসে পৌঁছিলাম, কি বল মাসি? আ, ভট্‌চায্যি মশাইকে সুস্থ দেখতে পেলে হয়! উঃ, কালকের রাতটা কী করেই কেটে গেছে!' বলিয়া সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বসিয়া পড়িল। মাসির স্তম্ভিত মুখের দিকে সে মুখ আর ফিরাইতে পারিল না, আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিয়া জানালার বাহিরে তাকাইয়া রহিল।

দিদিমা শুধু নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, 'ছেলেটি আমাদের কি উপকারই করলে! আহা, বেঁচে থাক্‌।'

মাসি ও দিদিমা কথালাপ করিতে লাগিলেন। প্রমীলা নীরবে বসিয়া রহিল। বহুদূর পর্য্যন্ত গিয়া পথের একটা বাঁক হইতে পিছনের পথে তাহার দৃষ্টি পড়িল। ধূলা উড়াইয়া মন্থর গতিতে গরুর গাড়ীখানা চলিতেছে! ভিতরের যাত্রীটিকে আর দেখা গেল না।

কলিকাতার কোলাহলের মধ্যে ভবেশ একদিন আসিয়া পৌঁছিল। দেহই আসিয়াছে, আত্মা আসে নাই। এই শহরকে ভবেশ আজ আর চিনিতে পারিল না, যদি বা কোথাও ইহাকে একটু অনুভব করিতে পারিল, মনে হইল সে ইহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

'কী ভবেশ, কবে এলে?'

'এই দিন চারেক হলো, তোমরা ভাল আছ?'

'হ্যাঁ, তুমি?'

'আমি? ঠিক কেমন আছি বলা কঠিন।'

ঠিক এমনিই বটে। সে সর্ব্বহারা হইয়াছে কিংবা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকার পাইয়াছে, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। তাই মনে হয় সমস্তটাই স্বপ্ন, সত্য নয়। এই দুইটা চোখ দিয়া সে দেখিতেছে শহরের জনতা, কলরোল, ট্রাম চলিতেছে, বাস্ ছুটিতেছে, কল-কারখানা, আইন-আদালত, মানুষের নৈতিক বুদ্ধি শাসন ও বিধির দ্বারা পরিবেষ্টিত জন-সমাজ। এখানে শুধু জীবনসংগ্রাম—এখানে এবং সর্ব্বদেশে, সকল জনপদে,—হানাহানি-রাহাজানি, সামান্য জীবন, ছোট-খাটো প্রয়োজনীয় সম্পর্ক, ব্যবসা-বাণিজ্য, দুই আর দুইয়ে চার, এখানে তাহার কিছু নাই।

সাতদিন পরে যথাসময়ে তাহার চিঠি আসিল। সত্যই আসিল। পথ ভুলে নাই, হারায় নাই, খোয়া যায় নাই, ঠিক

আসিয়া পৌঁছিল। ভবেশ 'ঘরের জানালা খুলিয়া দিল, গিরীশকে ডাকিয়া চারিদিক্ পরিচ্ছন্ন করিয়া লইল, একগোছা কৃষ্ণকলি ফুল উঠান হইতে আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল, পুরানো ধূপ বাহির করিয়া জ্বালিয়া দিল। তারপর বিছানার উপর ভালো করিয়া গুছাইয়া বসিয়া, মেয়েলি হাতের লেখা আঁকাবাঁকা ইংরেজি ঠিকানা লেখা খামখানা খুলিয়া ফেলিল।

'প্রিয়তম'

প্রথমেই 'প্রিয়তম' পড়িয়া ভবেশ বিছানা হইতে নামিয়া বাহির হইয়া গেল। নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। উল্লাসে চীৎকার করিয়া সে একবার হাসিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল। শোনো আকাশ, শোনো বাতাস, কান পেতে শোনো, মানব-সমাজ! জীবনে কোনো নারী তাহাকে 'প্রিয়তম' বলিয়া ডাকে নাই! মায়া? মায়া ত তাহাকে চিঠি লেখে নাই কোনোদিন! মায়া নাই, কোথাও সে নাই! বিশ্বসংসারকে আড়াল করিয়া একটিমাত্র নারী তাহার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে প্রমীলা! ভিতরে আসিয়া সে চিঠি পড়িতে বসিল।

প্রিয়তম,

আশা করি এতদিনে বাড়ী ফিরেছ। সাতটি দিন গুণে গুণে তোমায় চিঠি লিখচি। সাতদিন যেন সাত বছর। তোমাকে যেদিন শেষ ছেড়ে দিয়েছি, কি প্রাণ নিয়ে বাড়ী ফিরেছি তা ভগবান্ই জানেন। মনে হলো সব হারালুম।

ভাল চিঠি লিখতে আমি জানিনে, কত ত্রুটি থেকে যাবে, সমস্তই ক্ষমা ক'রো। লোকে রূপে বা গুণে ভালবাসে, আমার মধ্যে সবেরই অভাব ; তবুও যে আমায় ভালবেসেছ, এ কেবল তোমার নিজের গুণে। ঘরে আমি আর টেঁক্‌তে পারিনে, কেবল আকুলি বিকুলি হয়ে ছুটচি তোমার পিছনে পিছনে। তোমার সঙ্গে প্রথমে দেখা কবে হয়, কি কথা প্রথমে বলেছিলুম, সেই রাতে সমুদ্রের পথ, সে সব মনে পড়লে আর আমার কিছু ভাল লাগে না। (রাত্রে জেগে থাকি, জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখি) তোমার জন্যে দিনরাত অশান্তি ভোগ করচি, কথা বলিনে কারো সঙ্গে, তোমাকে যে তেমন করে আবার কোনোদিন পাবো এ আমার আশা হয় না। তুমি হয়ত আমাকে পাগল মনে করেছ।

তুমি কেমন আছ? তোমার শরীরের অবস্থা দেখে আমার ভারি চিন্তা হয়েছিল। আমার একান্ত অনুরোধ, [illegible] ওপর খুব লক্ষ্য রাখবে, এই কঠিন পথ পার হয়ে [illegible] তোমার করকমলে লেখা [illegible] এসে [illegible] তাকে এখানে কেউ সন্দেহ করে না, সবাই [illegible] তোমাকে ভালবেসে আমি যে আনন্দ পেয়েছি, সে আনন্দ আমি নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারিনি, রাখা যায়ও না, একটি হিন্দুস্থানী মেয়ে আমার কাছে সেলাই আর ছবি আঁকা

শিখতে আসে, তাকে বিশ্বাস করে গোপনে বলেছি। তার ঠিকানা দিলাম, এই ঠিকানায় আমাকে চিঠি দিও। তুমি আমাকে চিঠি দেবে কি না জানিনে, আমার কাছে তুমি অনেক বড়, অতি দুর্লভ। যদি তোমার মোহ ভেঙে গিয়ে থাকে তাহলে আত্মবঞ্চনা করে চিঠি লিখো না, তাতে আমরা দু'জনেই অপমানিত হবো। আমাকে আঘাত করো কিন্তু আমার ভালবাসাকে অপমান করো না, এই ভিক্ষা। তোমার মন্দির আমার মনে গড়ে উঠেছে, দেবতাকে যদি না পাই পূজো ত করে যেতে পারব? তোমার আবির্ভাব না হলে চোখের জল পড়বে কিন্তু সান্ত্বনাও পাবো। ইতি—

প্রমীলা।

চিঠি পড়িয়া ভবেশ আপন খেয়ালে হাসিতে লাগিল। হাসিতে হাসিতে চিঠিখানি পকেটে পুরিয়া সে বাহির হইয়া গেল। পথের চেহারা তাহার বদলাইয়া গিয়াছে, পুষ্পবীথিকার মত সুন্দর পথ, সমস্তই পরিচিত, সকল পথ গিয়া মিলিয়াছে প্রমীলার পদপ্রান্তে। আকাশ নির্ম্মল নীল, বাতাস চন্দন-গন্ধভারাতুর, মানুষের জীবনে কোথাও মালিন্য ও লজ্জা নাই, প্রাণের প্রাচুর্য্য, আনন্দময় পরমায়ু, চারিদিক রূপবান। ভবেশ পথে পথে ঘুরিল। এই নগর, এই জনপদ, মানুষের এই জটিল জীবনযাত্রা— ইহাদের মধ্যে থাকিয়াও সে বহুদূরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যাহাকে সে ভালবাসিয়াছে সে এক মহিমময়ী নারী, সে নারী

যে কল্পনার রাজকন্যা, তাহার পিছনে আছে মহাসাগর ও দিগন্ত-বিলীন আকাশের পটভূমিকা, পথযাত্রিণী প্রমীলা, সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহনক্ষত্র—ইহাদের সহিত তাহার পরিচয়, মানুষের বাসভূমিতে তাহার স্থান নাই, বিধি-নিষেধের মধ্যে তাহাকে জানিবার উপায় নাই, সে একাকিনী। পথে পথে ঘুরিয়া ভবেশ নানা উদ্ভট কথা ভাবিতে লাগিল।

সেইদিনই সে একটা বড় চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়া দিল। জানাইয়া দিল পনেরো দিনের মধ্যে সে পত্রের উত্তর আশা করিবে। ইহাও জানাইল, এই পনেরোটি দিন কী যন্ত্রণাদায়ক প্রতীক্ষায় তাহার দিন কাটিবে।

পনেরো দিনের মধ্যেই পিওন আসিয়া চিঠি দিয়া গেল। ভবেশ পিওনের হাত ধরিয়া হাসিয়া একটি টাকা বকশিস দিল।

'হৃদয় দেবতা,'

তোমার চিঠি পেয়ে মনে হ'ল নন্দনকাননের পারিজাত হাতে এল। শরীর ভাল ছিল না, ব্যথায় দেহ জরজর, দেহ আর মন। আমার অবস্থা তুমি সহজেই বুঝতে পারো। কিন্তু কি লিখেছ চিঠিতে? আমি কি সত্যিই রূপকথার মেয়ে, আমি কি দেবী? তোমার কল্পনা আর আনন্দ এতদূর ছুটে গেছে যে, আমি মনে মনেও ততদূরে পৌঁছিতে পারিনে। তোমার চিঠি পড়তে পড়তে আহ্লাদে আমার দেহ ও মন রোমাঞ্চ হয়ে ওঠে। চোখে নেশা লেগে দিশেহারা হই। তুমি সুন্দর ও জ্যোতির্ম্ময়!

ভালবাসার প্রথম অবস্থায় বোধ হয় থাকে দু' জনেরই অহঙ্কার, পরের অবস্থায় সে অহঙ্কার হয় চূর্ণ। আমার মনে হয় যে মেয়ে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে ভালবাসে, নিজের সম্মান তার হয়ত অটুট থাকে, কিন্তু ভালবাসা দূরে পালায়। সেই জন্যেই ভালবাসার সকলের চেয়ে বড় পরীক্ষা আঘাতে। ঝড় এসে বার বার ধাক্কা দেয় সেই গাছকে, যে গাছের শিকড় অনেক নীচে। যে ভালবাসা যত গভীর, লাঞ্ছনাও তার ততখানি, আমাকে আঘাত করে এই কথাটিই তুমি আমাকে শিখিয়েছ। তবু চিঠি তোমার সুন্দর, বার বার পড়ি এই জন্যে যে, বার বার তোমার চিঠি আমার কানে নতুন কথা বলে।

সুখের চেহারা আমি দেখিনি, দুঃখ আমায় বন্ধুরূপে চিরদিন আশ্রয় করেচে। তুমিও আমার দুঃখের, তোমাকে ভুলতেই পারব না জীবনে। সেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে আশ্চর্য্য তোমার আবির্ভাব, তুমিই আমার জল দেবতা। সেই পরম শুভদৃষ্টির লগ্নটি আমার মধ্যে অক্ষয় হয়ে রইল।

আমি এখানে সকলের প্রিয়পাত্রী, সকলের আদরের, কিন্তু এর অসারতা তখনই বুঝতে পারি যখন দেখি এদের পাশে রয়েছে আমার জন্য শাসন ও বন্ধন। সোনার শিকল দিয়ে আমি আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। ভয়ানক পরাধীনতা বলেই মুক্তির কামনা এত তীব্র। তুমি আমার মুক্তি। তোমার ভালবাসার ফাঁস এমন করে জড়িয়েছে যে, ছাড়াবার উপায় নেই, মৃত্যু পর্য্যন্ত এ ফাঁস যেন জড়িয়েই যেতে পারি। এর মাঝে ঘটবে

অনেক ভুল, অনেক ত্রুটী, তা হোক্, তুমি সংশোধন করে নিও, অপরাধ হয় ক্ষমা ক'রো। মুক্তির চেহারা আমি এতদিন পরে দেখতে পেয়েছি তাই আজ সমস্তই অসহনীয় মনে হচ্ছে। পরিবার পরিজন আমাদের বিরাট, বহু আত্মীয়-স্বজন, শ্রদ্ধা-প্রীতি-স্নেহ যশ এবং খ্যাতি, এদের মাঝখানে এতদিন বেড়ে উঠেছি, স্বামীর সঙ্গে পরিচয় হতে না হতেই সিঁদূর মুছে ফিরে এলাম, গুরুর কাছে নিলাম মন্ত্র, ঘুরলাম তীর্থে তীর্থে, সংযম এবং ব্রহ্মচর্য্যের খ্যাতিতে পরিবার ভরে উঠল, ধন্য ধন্য করল, শিক্ষায় দীক্ষায়, কাজে কর্ম্মে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মানুষ ক'রে তুলতে আমার মত মেয়ে নাকি ভূ-ভারতে নেই! সবাই আমার যশের কথাই শুন্‌ল, মনের কথা শুন্‌ল না। তুমি অনুভব ক'রেছ আমার মন, তোমার কাছে আমি মুক্তি পেয়েছি।

তুমি কষ্ট পাচ্ছ, তোমার দিন কাট্‌চে না, আমার অভাবে বেঁচে থাকাটা তোমার মিথ্যা বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু তুমি ত অধীর নও? আমি কী কর্ত্তে পারি জানিও। আমাকে ভালবেসে তুমি দুঃখ পাচ্ছ এই দুঃখটাই আমার বেশি বাজছে। অথচ তোমার জন্যে কিছু করতে পারি এমন ভরসা আমার নেই। তোমার পত্রে একটা লাইন আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, সে লাইনটা তোমার সমস্ত চিঠি থেকে আলাদা। পুরুষের মন যদি রঙে মাতে, মেয়ের মন মাতে রসে। তোমরা রঙ প্রকাশ করো অজস্র কথায়, আমরা রস প্রকাশ করি সামান্য ইঙ্গিতে, এই বোধ

হয় ব'লতে চেয়েছ, কেমন ? আমি দেবী নই সামান্য মানুষ, নগণ্য অনাদৃত একটি বিধবা মেয়ে, রক্তমাংসের দেহ, ক্ষুধা পেলে খাই, রোগ শোক আছে, আশা করি তুমি একথা ভুলবে না।

আর এক কথা। তোমাকে একবার দেখতে বড় সাধ হয়েছে। আগামী বুধবারে এখানে রিসাল্দার বাগে রাম-চন্দ্রের মেলা হবে, সন্ধ্যা সাতটার সময় ঝিকে নিয়ে ঠাকুর দেখতে যাবো, তুমি এসো। তুমি এলেই আমাকে পাবে। তবু বলি, আসবার আগে নিজের মনকে তুমি একবার পরিচ্ছন্ন করে অনুভব করো, কারণ, সেই পুরাণো কথাটাই আর একবার বলি, প্রেম আর মোহের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। আমি নিজেকে জানি তাই তোমাকে একথা বলতে আমার ভয় নেই।

প্রমীলা

চিঠি পড়িয়া ভবেশ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। প্রমীলা ত বেশ গুছাইয়া কথা বলিতে পারে !

সেইদিন রাত্রেই সে নাচিতে নাচিতে গিয়া লক্ষ্ণৌর টিকিট কিনিয়া ট্রেণে চড়িয়া বসিল। গাড়ী ছাড়িবার পর একাগ্রমনে সে ধ্যানে বসিয়া রহিল, আজ সে সত্য সত্যই তীর্থ দর্শনে যাইতেছে, প্রমীলা ছাড়া অন্য চিন্তা তাহার নাই, বাস্তবিকই নাই, এবং এমনি করিয়াই যখন তাহার চোখের উপর দিয়া সকাল হইয়া আসিল তখন সে সবিস্ময়ে অনুভব করিল,

প্রমীলার নামের তিনটি অক্ষর ছাড়া আর কিছুই সে ভাবে নাই।

সকাল এবং দুপুর অসহ্য যন্ত্রণা এবং প্রতীক্ষায় কাটাইয়া অপরাহ্ণে সে লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে আসিয়া নামিল। শীতের সূর্য্য তখন অস্তাচলে নামিয়াছে।

সঙ্গে কিছুই সে আনে নাই, কেবল একখানি মাত্র কম্বল। কম্বলখানি ষ্টেশন মাস্টারের কাছে জমা রাখিয়া সে বাহিরে আসিয়া একখানি টাঙা ভাড়া করিল। পথ অল্পই, ষ্টেশনের গণ্ডী হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর গিয়া সে রিসাল্‌দারবাগ আবিষ্কার করিল। রামচন্দ্রজীর মেলায় তখন সবেমাত্র লোক জড় হইতে সুরু করিয়াছে। প্রমীলাদের বাসা হয়ত এই কাছাকাছি কোথাও হইবে, পাছে দিদিমা অথবা সেই মাসির চোখে পড়িয়া যায় এই আশঙ্কায় সে গাড়োয়ানকে কহিল, 'এখনো একঘণ্টা দেরী আছে, আমাকে তুমি শহরটা একবার ঘুরিয়ে দাও।'

গাড়োয়ান তাহাকে শহর ঘুরাইতে চলিল।

বাংলা দেশের চেয়ে পশ্চিমের যে কোন জায়গা তাহার ভাল লাগে। সত্য কথা বলিতে কি, লক্ষ্ণৌর মত দেশ পৃথিবীতে অতি বিরল। শহরের একটা রাস্তা দিয়া সে বড় একটা বাজার পার হইয়া মাঠের কাছাকাছি পড়িল। চারিদিকে আলো জ্বলিয়া এই সুন্দর শহরটি সুসজ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। দূরে দুর্গপ্রাকার দেখা যাইতেছিল। দক্ষিণ দিকে নবাবগণের

প্রাসাদ, ওদিকে ক্ষীণ-স্রোতা গোমতী নদী, নদীর ওপারে স্কুল-কলেজ। গাড়ী করিয়া একাকী ভবেশ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

যথাসময়ে মেলার ধারে আসিয়া নগদ পাঁচটী টাকা বিস্মিত যানচালকের কাছে ফেলিয়া দিয়া ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল। হাতঘড়িতে দেখিল সাতটা বাজিয়াছে। কম্পিত দেহ, শঙ্কিত মন, স্পন্দিত হৃদয়—সে যেন একটা ভয়ানক অপরাধ করিতেছে। সমস্ত জনতা তাহার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া যেন তাহার গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছিল। এদিক ওদিক তাকাইয়া দেখিল প্রমীলা এখনও আসে নাই। এই ছয়শত মাইল রাস্তা সে আসিয়াছে মাত্র দুই এক মিনিটের জন্য একজনকে চোখের দেখা দেখিতে। চোখে দেখিয়াই তাহার অসীম তৃপ্তি। যে-চোখ, যে-মুখ, যে-হাসি সে তাহার সারা জীবনেও কোথাও দেখিতে পায় নাই, যাহার জন্য সে জন্ম-জন্মান্তর, বহু জীবনের পথে পথে, লোকে লোকে এই মানব দেহ লইয়া অন্বেষণ করিয়া ফিরিয়াছে, তাহার দেখা পাইতে আর বিলম্ব নাই। বিবাহ সে করিয়াছিল বটে, মায়ার মত মমতাময়ী লক্ষীরূপা নিষ্পাপ একটি নারীও তাহার জীবনে আসিয়াছিল, পাঁচ বছর ধরিয়া তাহার সহিত ঘরও করিয়াছে, সেখানে আনন্দ ছিল কিন্তু জয়ের উল্লাস ছিল না, অপূর্ব্ব তৃপ্তি ছিল কিন্তু রসের উত্তেজনা ছিল না। মায়া ছিল তাহার সহজে পাওয়া, নির্বিঘ্নে পাওয়া, সংস্কারের মধ্যে, বোঝাপড়ার মধ্যে, সামাজিকতার মধ্যে

বিনা পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে, বাধ্য-বাধকতায় তাহার সহিত পরিচয়। কিন্তু এ যে দুর্লভ, এ যে দুষ্প্রাপ্য, এ যে মানুষের যুগ-যুগান্তের স্বপ্ন, ইহার মধ্যে যে তাহার প্রসারিত বিস্তৃত কল্পনা, দুঃখের তপস্যার ভিতর দিয়া যে এ নারীর বিস্ময়কর আবির্ভাব—ভাবিতে ভাবিতে ভবেশের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। একদিন যে রহস্যময়ী সুদূর দক্ষিণ সমুদ্র মন্থন করিয়া পাতাল-কন্যার মত জাগিয়া উঠিয়াছিল আজ সে দেখা দিবে মানবরূপিণী হইয়া, আজ সে জন-জনতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিবে। একদিন ইহার পিছনে ছিল মহাসাগর, অনন্ত আকাশ, সর্ব্বব্যাপিনী পূর্ণিমা, আজ ইহার পিছনে সীমাহীন প্রশান্ত হিন্দুস্থান, লোকালয়, মানব-সমাজ—এমনি একটি নারীকেই সে চাহিয়াছিল। গৃহ-বন্ধনের ভিতর যে-প্রেম আত্মগোপন করিয়া নাই, যে-প্রেমের আছে ব্যাপকতা, বিস্তৃতি, পৃথিবীময় যে-প্রেম আপন পদচিহ্ন রাখিয়া চলিয়াছে, সেই প্রেমই তাহার কাম্য।

কোন্‌দিকে সে চাহিয়াছিল তাহা হুঁস নাই, টুক্‌ করিয়া একটি কাগজের পাকানো গুলি তাহার পায়ের উপর আসিয়া পড়িতেই সে এত কোলাহলের ভিতরেও চমকিয়া উঠিল। পায়ের কাছে একবার তাকাইয়া সে মুখ ফিরাইয়া চাহিল। শরীরের সমস্ত রক্ত তাহার ঝিম্‌ ঝিম্‌ করিয়া অস্ফুট কথা কহিয়া উঠিতে লাগিল। হাত কয়েক দূরে প্রমীলা আসিয়া দাঁড়াইয়া স্মিতমুখে তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

কাগজের গুলিটা সে তুলিয়া লইল কিন্তু কথা বলিতে পারিল না, প্রমীলার সহিত ঝি আসে নাই, আসিয়াছেন দুইটি মহিলা—একটী প্রবীণা, অন্যটি অল্পবয়স্কা। অলক্ষ্যে চাহিয়া ভবেশ হাসিল। এ হাসি যে কী তাহা সে নিজেই অনুভব করিতে পারিল না, দীর্ঘ বিরহের পর প্রিয়জনের দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিয়া মানুষ বোধ করি এমনি করিয়াই হাসে, হাসির নাম করিয়া এমনি করিয়াই হয়ত আপন হৃদয় কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়।

ঠাকুর প্রণাম করিয়া প্রমীলা ও তাহার আত্মীয়ারা মেলার ভিতর বেড়াইতে লাগিল। মাঝখানে খানিকটা ব্যবধান রাখিয়া ভবেশ তাহাদের কাছে কাছে রহিল, কী বলিবে কী করিবে তাহা ভাবিয়াই পাইল না। চোখে চোখে তাহারা কথা কহিল, জনতার লক্ষ্য এড়াইয়া হাসিতে লাগিল, ইহার বেশী আর অগ্রসর হইবার উপায় ছিল না। প্রমীলার মুখখানির উপর হইতে পথশ্রমের সেই মালিন্যটুকু মুছিয়া গিয়াছে, পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর সে-মুখ, হাসিলে দাঁতগুলি ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠে, চোখ দুইটি বুদ্ধিমত্তায় দীপ্ত। পরণে তাহার দামী তসরের ধুতি, গঙ্গার জলের মত তাহার রঙ, গায়ে একখানি মূল্যবান আলোয়ান—সুরুচি ও শুচিতা, গৌরব ও গাম্ভীর্য্য, সর্ব্বাঙ্গের ভঙ্গীতে সাধারণ মেয়ের মত কোথাও তাহার অভদ্র ইঙ্গিত নাই, সে যেন আপন মহিমায় উজ্জ্বল। এই মেলার ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভালবাসার জন্য যে চৌর্য্যবৃত্তিটুকু

তাহাকে করিতে হইতেছে ইহার স্বাভাবিক গ্লানি তাহার লাগিতেছে না, ইহা তাহার লজ্জা নয়, কৌতুক, তাহার অস্বাভাবিক জীবন-যাত্রাটুকু লইয়া কৌতুক, নিজের প্রতি ব্যঙ্গ, যে মানব-সমাজ তাহার মাথায় বিধি ও নিষেধের বোঝা চাপাইয়া বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছে তাহার উপর মধুর প্রতিশোধ। অথচ এ প্রতিশোধের সকলের চেয়ে বড় অস্ত্র হইয়াছে হৃদয়ের স্বতঃউৎসারিত মহিমময় ভালবাসা।

এক সময় দেখা গেল তাহাদের চোখে মুখে আর হাসি নাই, দৃষ্টি-বিনিময়ের ভিতর দিয়া সেই চাঞ্চল্যটুকু কখন্ অন্তর্হিত হইয়াছে। এই মেলা, এই আলো, এই দোকান-পসার, জন-কলরব, সঙের নাচ, হাসি, তামাসা, ঠাকুর-দেবতা—সমস্ত কিছুকে ছাড়াইয়া তাহারা গভীর অতলের মধ্যে তলাইয়া গিয়াছে, সেখানে তাহাদের কারুণ্যের নিবিড় আনন্দ, দুঃখের অপরিমিত ঐশ্বর্য্য, বেদনার অনির্ব্বচনীয় রসলোক।

দুইজনে একবার কথা বলিবার চেষ্টা করিল, শেষ চেষ্টা, কিন্তু সুবিধা হইয়া উঠিল না। অনেক লোকজনের ভিতর দিয়া ভবেশ অতি সন্তর্পণে একটুখানি সরিয়া আসিল, অন্য দুইটি মহিলা তখন কয়েকটা মাটির পুতুলের দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন, এ সুযোগ প্রমীলা আর ত্যাগ করিতে পারিল না, ধীরে ধীরে হাতখানি বাড়াইয়া সে ভবেশের একখানা হাত চাপিয়া ধরিল, একটি মুহূর্ত্ত মাত্র, তারপর হাতখানি সে সরাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেই ভবেশ তাহার হাত একটু চাপিয়া দিল।

উষ্ণ ও সুনিবিড় স্পর্শ, কিন্তু তাহারই ভিতর দিয়া পরস্পর যে কথা কহিয়া গেল তাহার আর কোনো ভাষা নাই সে-কথা অনুভব করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

আবার তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল এবং আর একবার তাহার দিকে তাকাইয়া প্রমীলাকে তাহার আত্মীয়াদের সহিত বাহির হইয়া যাইতে হইল। ভবেশ চলিল তাহাদের পিছনে পিছনে, যাইবার আর কোনো কারণও ছিল না, সুযোগও আর মিলিল না, তবু তাহাকে যাইতেই হইল। কিছুদূর গিয়া আর একটা পথের বাঁকে ফিরিবার সময় পিছনদিকে হাত নাড়িয়া প্রমীলা তাহাকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল।

ভবেশ থমকিয়া দাঁড়াইল। রাত্রির অন্ধকারে একটু একটু করিয়া লক্ষ্ণৌ শহর তাহার চোখ হইতে মুছিয়া গেল। কোথাও আর আলো নাই, বায়ু নাই, আকাশ নাই, মানুষের সকল কণ্ঠস্বর ডুবিয়া গেল, সমস্ত পথগুলি জড়াইয়া জট পাকাইয়া তাল-গোল হইয়া গেল, গাড়ীঘোড়া যান-বাহনগুলা ছায়াবাজির মত সরিয়া যাইতেছে—সে নির্ব্বাক, নিষ্ক্রিয় ও নিঃসম্বল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সেদিন সমস্ত রাত ষ্টেশনের ওয়েটিং-রুমে পড়িয়া থাকিয়া ভোরের দিকে সে যখন গাড়ীতে উঠিয়া বসিল, তখন তাহার দেহে আর চেতনা নাই। গাড়ী চলিতে লাগিল, কম্বলখানা মুড়ি দিয়া ভূতের মত একপাশে সে বসিয়া রহিল। তন্দ্রায় চোখ জড়াইয়া আসিতেছে কিন্তু ঠিক ঘুম নাই। অনেকক্ষণ

এমনি করিয়া কাটিবার পর সে ভিতরের পকেট হইতে এতক্ষণে সেই চিঠিখানা বাহির করিয়া আর একবার পড়িতে বসিল।

'প্রিয়তম,'

কথা বলার সুযোগ হয়ত পাব না তাই এই চিঠি! আমার অনুরোধে এতদূর পথ যে এসেছ এ আমি ভাবতেই পারিনে! সৌভাগ্যেরও সীমা আছে, আমার সৌভাগ্য অসীম। কলকাতা গিয়েই আমাকে চিঠি দিও। কী করব, তোমাকে একান্ত করে কাছে পাবার সাধনা আমি করিনি। বড় কষ্টে দিন কাটচে, প্রিয়জন কাছে নেই, মেয়েমানুষের এর চেয়ে বড় দুঃখ আর কি আছে? অথচ এমনি করেই আমাদের চলতে হবে। প্রণাম নিও।

প্রমীলা।

চিঠি পড়িতে পড়িতে ভবেশ অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িল।

শীতের শেষে একদিন বসন্তকাল আসিয়া দেখা দিল। বসন্ত আসিল তাহার রঙ লইয়া, রস লইয়া, সমারোহ লইয়া। দক্ষিণ সমীরে উত্তরীয় উড়াইয়া ঋতুরাজ দুয়ারে দুয়ারে করাঘাত করিয়া চলিল।

রোগশয্যায় কয়েকদিন কাটাইয়া সেদিন সকালে ভবেশ বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। গিরীশ আসিয়া দরজা ও জানালাগুলি খুলিয়া দিতেই একরাশ আলোয় ঘর ভরিয়া গেল।

ভিতর-বাহির সকালের পরিচ্ছন্ন সূর্য্যকিরণে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বাহিরের গাছগুলিতে এখনও শিশির পড়ে, কিন্তু তাহার বিন্দুগুলি অতি ক্ষণস্থায়ী। সুমুখে একটা অশোকগাছে ফুলগুলি দিন দিন রাঙা হইয়া উঠিতেছে। নিমগাছটির ডালে ডালে চিক্কণ কোমল ও ফিকে সবুজ কিশলয় গজাইয়া ঐশ্বর্য্যবান হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের উপর পড়িয়াছে প্রভাতের সূর্য্যরশ্মি, কোমল ও উজ্জ্বল।

'গিরীশ ?'

'কি বলচেন বাবু ?'

কি কথা বলিতে গিয়া ভবেশ সব ভুলিয়া গেল। গিরীশ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া সে মৃদু নির্লিপ্ত কণ্ঠে কেবল কহিল, 'এত বড় বাড়ীতে তুই একা থাকিস কেমন করে গিরীশ ?'

গিরীশ কহিল, 'সে আমার সয়ে গেছে।'

ভবেশ চুপ করিয়া কিয়ৎক্ষণ বাহিরের দিকে তাকাইয়া বলিল, 'সংসার তুই কেমন করে চালাস্, কষ্টের সংসার, নয় ?'

কাঁচের গ্লাসে ঔষধ ঢালিয়া গিরীশ কহিল, 'কষ্ট কেবল আপনার, আমার নয় বাবু। আপনার কথা ভাবলে আমার সব গোলমাল হয়ে যায়।'

ভবেশ আবার চুপ করিয়া আছে দেখিয়া সে পুনরায় কহিল, 'চলুন বাবু, এই অসুখ শরীর, একটু ভাল হয়ে উঠলেই, আপনাকে নিয়ে কোথাও চলে যাই।'

'কোথায় যাই বল্ ত ?'

'যেখানে হোক চলুন,—আমারো কেউ নেই বাবু।'

ভবেশ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া শীর্ণ একটু হাসিল, বলিল, 'বেশ, যেখানে তোর ইচ্ছে আমায় নিয়ে চল্, কিন্তু মনে করিসনে আমাদের কেউ নেই! আছে, আছে গিরীশ, আছে। সংসার দুঃখময় হতে পারে কিন্তু মরুময় নয়।'

গিরীশ তাহার কথা আর বুঝিতে পারিল না। বাবু তাহার বিদ্বান্ এবং পণ্ডিত, তিনি হেঁয়ালী করিলে মানায়। মূর্খ সে।

গিরীশ বাহির হইয়া গেল এবং মিনিট কয়েক পরে একবাটি গরম দুধে অল্প চা মিশাইয়া সে যখন আবার আসিয়া টিপয়ের উপর নামাইয়া রাখিয়া শীঘ্রই খাইতে বলিয়া গেল, ভবেশ তখন রবিবাবুর 'ক্ষণিকা' লইয়া পড়িতেছে। পড়িতে পড়িতে এক সময় কখন উন্মনা হইয়া সে কবিতার অক্ষরগুলির দিকে তাকাইয়া রহিল, চোখে তখন তাহার জল ভরিয়া আসিয়াছে।

কাব্য ও সাহিত্যের চেয়ে জীবন অনেক বিস্তৃত, বহু বিচিত্র। কবিতার বই রাখিয়া দিয়া সে কালি-কলম ও কাগজ লইয়া চিঠি লিখিতে বসিয়া গেল—

প্রমীলা,

ইতিমধ্যে তোমার দু'খানা চিঠি পেয়েছি। অসুস্থ বলে উত্তর দিইনি। চিঠিতে অসুস্থ মন প্রকাশ পেলে লজ্জার কথা। তোমার পত্রে মনে হলো, আমার একখানা চিঠি মারা গেছে, ভালবাসার চিঠি মারা গেলে বড় লাগে। তোমার পত্রগুলি

সুন্দর, লঘু রঙিন মেঘের মত, আমার আকাশে তারা অবিশ্রান্ত ভেসে ভেসে বেড়ায়। তোমার শেষ চিঠি পেয়ে আমি বাঁচলাম প্রমীলা, বাঁচলাম। দরজায় আমার মঙ্গলঘট, আমপাতা, আল্পনা, ঘরে ধূপ-ধূনো, আরতির দীপ জ্বালানো, এমন সময় চিঠি এলো, দেবী এলেন। চোখে জলে তোমায় বরণ করে তুললাম। তুমি নিজেকে সামান্য বলে পরিচয় দিয়েছ, তর্ক আমি করব না, কিন্তু আমি সেই সামান্যর মধ্যে অসাধারণকে আবিষ্কার করে নিয়েছি, আমি সৌভাগ্যবান। তোমাকে আমি ভুলে গেছি এই অনুযোগ করেছ। দেহের রক্তকেও ত মানুষ ভুলে থাকে অথচ প্রতি মুহূর্ত্তেই সে মানুষের জীবনের রস যোগায়, প্রাণকে সঞ্জীবিত করতে থাকে, শরীরকে সচল ও কর্ম্মময় করে রাখে। তোমার নামের তিনটি অক্ষর আমার স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল জুড়ে রয়েছে, তোমাকে ভোলা সহজ নয়।

এত শাসন এবং এত বাধা বলেই আমাদের এত চৌর্য্যবৃত্তি। বিধি ও নিষেধ সহজ প্রাণ-লীলার কণ্ঠরোধ করেছে, আমাদের ভালবাসা লোকচক্ষে তাই কলঙ্কময়। অথচ তাই যদি হয়, কলঙ্কই যদি বড় হয়ে ওঠে, হৃদয়ের মুল্য যদি অস্বীকৃত হয়, তার লজ্জাই যদি তোমাকে মলিন করে তোলে, তাহলে আমাকে বিদায় দিও। বার বার তোমাকে চোখেই দেখব, কাছে পাব না, এর চেয়ে যন্ত্রণা আর কিছু নেই। আমরা দু'জনেই দু'জনকে একান্ত করে চাই এইটেই আমাদের সকলের বড় দাবী, বড় অধিকার, একথা চীৎকার করে বলতে আমি যেন কোনো-দিন

ভয় না পাই। সমাজের বৃহৎ প্রয়োজনের কাছে আমাদের ভালবাসা হয়ত সামান্য, তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র, কিন্তু আমাদের এই ব্যর্থতায় কি তার আন্তরিক স্বাস্থ্য ভাল থাকবে? আমাদের উজ্জ্বল জীবন, মহত্তর সম্ভাবনা, ঐশ্বর্য্যশালী ভবিষ্যৎ—এদের পঙ্গুতায় যে লজ্জা, সে কি শুধু আমাদেরই?

দিন আমার কাটে না, বিশ্বাস করো প্রমীলা, দিন আমার আর কাটে না। আমি সমুদ্র হয়ে রইলাম, তুমি হয়ে রইলে আকাশ, দু'জনেই ছুটছি স্পর্শের আগ্রহে কিন্তু মিলন হয় না। শীত গেল, বসন্তও চলে যাবে, গ্রীষ্মের পর নামবে বর্ষা, বছরের পর বছর ঘুরবে—কিন্তু কেন? কী এর প্রয়োজন? ব্যর্থই যদি হলাম, নিঃশেষে সব মুছে যায় না কেন? কেন বাতাসে বারে বারে তোমার গন্ধ ভেসে আসে, কেন এই জ্যোতির্ম্ময় রৌদ্রে তোমার মূর্ত্তি আমাকে এমন করে দিশেহারা করে? দিন আমার কাটে না প্রমীলা।'

চিঠির নীচে নামসই করিয়া সে গিরীশের হাতে ডাকঘরে পাঠাইয়া দিল।

দিন আষ্টেক পরে চিঠির উত্তর আসিল। চিঠি খুলিয়া পড়িয়া তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। প্রমীলা লিখিয়াছে—

প্রিয়তম,

এবার আমাদের অগ্নিপরীক্ষা। বিপদের দিন এসেছে। সব কথা জানাবার সময় নেই। চিঠি পেয়েই তুমি দিল্লী

রওনা হবে। মামার ওখানে এরা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে। আগামী রবিবারে বেলা তিনটার সময় কুতব-মিনারের নীচে আমি তোমার অপেক্ষায় থাকবো। এদিকে সর্ব্বনাশ, তোমার সব চিঠিগুলি আমার বাক্সের ভিতর থেকে ধরা পড়ে গেছে, বাড়ীতে হৈ চৈ উঠেছে। আমার অবস্থাটা বুঝে দেখো। আজই দিল্লী চললাম। প্রণাম নিও।

প্রমীলা

ভবেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘড়ির দিকে চাহিল, বেলা দুইটা বাজে। আজ শুক্রবার। তাড়াতাড়ি জামা জুতা পরিয়া সে নীচে নামিয়া আসিল। চীৎকার করিয়া কহিল, 'গিরীশ ?'

'আজ্ঞে বাবু ?'

'সব যোগাড় করে রাখ্, আজই দিল্লী রওনা হতে হবে, বেলা পাঁচটায় গাড়ী।' বলিয়া সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। ভিতরে তখন তাহার প্রচণ্ড গতির নেশা জাগিয়া উঠিয়াছে।

রাস্তায় পড়িয়া সে সুমুখে একখানা ট্যাক্সি পাইয়া বিদ্যুৎ-গতিতে তাহার উপর চড়িয়া বসিল। বলিল, 'চলো ইম্পি-রিয়াল ব্যাঙ্ক্।'

আবার সেই পথ, সেই পরিচিত প্রান্তরগুলি, সেই ছোট বড় অসংখ্য ষ্টেশন। পাঞ্জাব-মেল হু হু করিয়া ছুটিতেছে। দিল্লী এক্স্প্রেসে আসিতে আসিতে পথে সে পাঞ্জাব-মেল

পাইয়া গাড়ী বদ্‌লাইয়া লইয়াছে। দ্রুতগতি, দ্রুততর,— ইচ্ছা হইল গাড়ী হইতে ঝাঁপাইয়া সে বাকি পথটা আরও দ্রুতবেগে ছুটিয়া পার হইয়া যায়। কী অবস্থা হইয়াছে প্রমীলার এতক্ষণে? প্রমীলার দুঃখ সে সহিবে, অসম্মান সহিবে না!

শনিবার গভীর রাত্রে সে দিল্লী আসিয়া পৌঁছিল। অত বড় ষ্টেশন প্রায় জনবিরল, যে কয়েকজন যাত্রী উঠা-নামা করিল, তাহারা একে একে অদৃশ্য হইয়া গেল। ভবেশ একবার এদিক ওদিক তাকাইয়া দেখিল, ভিতরে তখন তাহার ঝড় বহিতেছে, এ রাত্রে কোথায় সে যাইবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। এদেশে তাহার পরিচিত কেহ নাই, থাকিলেও পথ খুঁজিয়া কোথাও যাওয়া কঠিন। কোনো সুবিধা করিতে না পারিয়া সে ওয়েটিং-রুম্ খুঁজিয়া বাহির করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। লোকজন কেহ নাই, একখানা ইজিচেয়ারের উপর সে হেলান্ দিয়া শুইয়া পড়িল। পথে একখানা খবরের কাগজ কিনিয়াছিল তাহাই উল্‌টাইয়া একবার পড়িবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না, মাথা ঘুরিতেছে, শরীর এখনও ভাল করিয়া সারে নাই, আজ সমস্ত দিন প্রায় অনাহারেই কাটিয়াছে।

বসিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে তাহার ঘুম আসিল, ঘুমাইয়াও পড়িল। সেই ঘুম যখন তাহার কি একটা গোলমালে ভাঙ্গিয়া গেল, তখন সকাল হইয়াছে।

চোখ চাহিয়া দেখিল, জন চার পাঁচ লোক তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। লোকগুলাকে দেখিয়া তাহার কেমন যেন সন্দেহ হইল, প্রশ্ন করিবে কিনা ইতস্ততঃ করিতেছিল এমন সময় একটি কোটপ্যান্ট্ পরা লোক তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া ইংরেজিতে কহিল, 'আপনি কোথা থেকে আসচেন ?'

ভবেশ কহিল, 'কলিকাতা থেকে। কেন ?'

'আপনি কি বাঙালী ?'

'হ্যাঁ, কি চান্ ?'

'আমরা পুলিশের লোক……আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে।'

'থানায় ? তার মানে ?'

মুখ চাওয়াচায়ি করিয়া দুইজন হাসিল। একজন কহিল, 'কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আপনাকে যেতেই হবে।'

উদ্ধত কণ্ঠে ভবেশ কহিল, 'অকারণে ? অকারণে থানায় যাবার কোন কারণ নেই।'

একজন হাসিয়া কহিল, 'আপনাকে যে আমরা গ্রেপ্তার করেছি !'

'গ্রেপ্তার ? অপরাধ ?'

'থানায় গিয়ে অপরাধ জান্তে পারবেন।'

'তার আগেই আমি জান্তে চাই। ওয়ারেণ্ট এনেচেন ?'

তাহারা ওয়ারেণ্ট খুলিয়া দেখাইল। বিপজ্জনক বাঙালী বলিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইতেছে। রাজনৈতিক গুপ্ত

কারণ ছাড়া তাহাতে আর কিছু উল্লেখ নাই। ভবেশ বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া এই অসীম কীর্ত্তিমান পুলিশের দিকে তাকাইল। তারপর কহিল, 'বাঙালী এদিকে এলেই কি তাদের সঙ্গে আপনারা এই ব্যবহার করেন ?'

'না, এ শুধু আপনার সম্বন্ধে।'

আগাগোড়া সমস্তই যখন উল্‌টাইয়া গেল তখন ইহাদের সহিত বচসা করিয়া ব্যাপারটাকে ভবেশ আর তিক্ত করিয়া তুলিল না। উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'বেশ চলুন যাচ্ছি থানায় কিন্তু খানায় যেন পড়িনে, দেখবেন, আমি পুলিশ সম্বন্ধে সব রকম গুজবই বিশ্বাস করি।'

'কি রকম, কি রকম ?'

'সে সব কথা সভায় দাঁড়িয়ে বলতে হয়, চেঁচিয়ে বলা দরকার। গোপনে বললে আপনাদের লজ্জা আসবে না।'

সবাই হাসিল, হাসিয়া কহিল, 'পুলিশের লজ্জা বলে কিছু আছে ?'

ভদ্রভাবেই তাহারা গ্রেপ্তার করিল। ইন্‌স্পেক্টরের দিকে চাহিয়া ভবেশ কহিল, 'সভ্যতায় আর কাজ নেই, দয়া করে করে হাত-কড়া কিম্বা কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যান্।'

ইন্‌স্পেক্টর কহিল, 'আপনি রাগ করচেন কেন, এ আমাদের চাকরি !'

ভবেশ কহিল, 'এ অজুহাত ত লাটসাহেবেরও আছে। কিন্তু সে কথা নয়। যাঁরা ভদ্র এবং সম্ভ্রান্ত তাঁদের অসম্ভ্রম

করাই এখানকার পুলিশের একটা বড় কাজ।' বলিয়া রাগে অন্ধ হইয়া সে সকলের সহিত একখানা গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

থানায় আসিয়া সে জানিতে পারিল, কি একটা বিপ্লবাত্মক ষড়যন্ত্রে কয়েক জন বাঙালী এখানে ধরা পড়িয়াছে, দুই এক-জন পলায়ন করিয়াছে, অতএব বাঙালী মাত্রেই এদিকে সন্দেহ-জনক। ভবেশের হাসি পাইল। মানুষের জীবনে অকারণে যে কত বিঘ্ন ঘটে, অকারণে পুলিশে গ্রেপ্তার না হইলে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তাহার নিকট একটা বিবৃতি লওয়া হইল।

'আপনার নাম কি বলুন?'

ভবেশ কহিল, 'সর্ব্বেশ্বর ঘটক।'

'কলকাতার ঠিকানা?'

'জগাই-মাধাই রোড, ৯৯৯ নম্বর!'

বহু মিথ্যা কথা সে রাগে অবাধে বলিয়া গেল। তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া কেহই অবিশ্বাস করিতে পারিল না, একে একে সমস্তই লিখিয়া লইল। পেশা কী জিজ্ঞাসা করা হইলে সে কহিল, ভেড়া, ছাগল, মুরগী ও শূকর পালন করা তাহার কারবার। মুরগী ও শূকরের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু।

'আপনি হিন্দুর ছেলে হয়ে—' বলিয়া এই পরম হিন্দুরা বোধ করি ঘৃণায় নাসাকুঞ্চিত করিল।

'কি করব বলুন, যাঁরা রাজত্ব করেন তাঁদের খোরাক যোগাই। জমাটি কারবার। জাহাজে ভেড়া মুরগী সাপ্লাই করি।'

এত করিয়াও তাহাকে থানার হাজতে থাকিতে হইল গোপনে চারিদিকে পাঠানো হইল, কিন্তু কোনোখান হইতেই এই গ্রেপ্তার সমর্থন করিয়া কেহ জানাইল না।

লোকগুলি যে ভদ্র তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মেথর ডাকাইয়া তাহারা থানার হাজত পরিষ্কার করাইয়া দিল। সাব-ইন্স্‌পেক্টরের বাড়ী হইতে এই সম্ভ্রান্ত বাঙালীটির জন্য বালিশ ও বিছানা আসিল। একজন কন্স্‌টেবল গিয়া প্রাতরাশ আনিয়া হাজির করিল। আর একজন মুখ ধুইবার সরঞ্জাম, সাবান ও তোয়ালে আনিল। বেশ একটা সোরগোল উঠিল।'

লোহার গরাদের ভিতর হইতে বন্দী কহিল, 'কতক্ষণ পর্য্যন্ত এই নরক দর্শন চল্‌বে মিস্টার?'

'ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে খবর পাঠানো হয়েছে।'

'খবর আসতে কত দেরী?'

'কি করে বলি বলুন? আজ বোধ হয় আপনাকে এখানেই থাকতে হবে।'

ভবেশের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। সাঁতার না জানিয়া নিরুপায় হইয়া মানুষ যেমন তৃণ ধরিতে গিয়া জলের ভিতর তলাইয়া যায়, তাহারও হইল তেমনি। যেদিনটি তাহার জীবনে সকলের চেয়ে মূল্যবান, সেই দিনটিতেই তাহার বিরুদ্ধে বিধাতার এই চক্রান্ত। গলা বাড়াইয়া সে কহিল, 'তার চেয়ে আমাকে ফাঁসী দিন্।'

যে লোকটি কথা কহিতেছিল, তাহার ভিতর সম্ভবতঃ এক বিন্দু মনুষ্যত্বও অবশিষ্ট আছে। সে ঈষৎ স্নিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'এখানে কি হাওয়া বদ্‌লাতে এসেছিলেন? সঙ্গে জিনিসপত্র ও মেয়েছেলে থাকলে আমরা চট্ করে সন্দেহ করিনে। বোঝেন ত, এখনকার দিনে—'

'হাওয়া বদলাতে আমি আসিনে, এখানকার হাওয়া বিষাক্ত।'

'কোনো আত্মীয়র বাড়ীতে বুঝি—?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে ব্যবসা সম্পর্কে এসেচেন?'

ভবেশের চোখ দুইটা জ্বালা করিতেছিল। বলিল, 'তবে বলি শুনুন। একটি নারীর সঙ্গে আমার অবৈধ প্রণয় ঘটেচে, কাঁচা বয়েস কিনা, তাই ভারি কষ্ট পাচ্ছি, ছুটে এসেছি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।'

লোকটা অবাক হইয়া তাহার দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া রহিল, তারপর হঠাৎ হো হো করিয়া অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া উঠিল।

লোকজন একে একে চলিয়া গেল, দুইজন কনষ্টেবল কেবল জীবন্ত যমদূতের মত পালা করিয়া তাহাকে পাহারা দিতে লাগিল।

ভিতরে বসিয়া শুইয়া ঘড়িতে সময় দেখিয়া ভবেশের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত অসহ্য বোধ হইতেছিল। অথচ কোনো উপায়

নাই। চারিদিকে উচ্চ দেয়াল, প্রস্তর নির্ম্মিত বন্দীশালা, উপর দিকে একটি মাত্র ক্ষুদ্র জানালা, তাহার ভিতর দিয়া কুণ্ঠিত আলোকরশ্মি আসিবার চেষ্টা করিয়াও ফিরিয়া যাইতেছিল। সম্মুখে লোহার দরজায় পাহারা। বাহিরে রাস্তায় ট্রাম গাড়ীর শব্দ ও জনকোলাহল অস্পষ্ট কানে আসিয়া সঙ্গীতের মত শুনাইতেছে। কে একজন এই থানার ভিতরেই চীৎকার করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল। মনে হইল, জমাট ও নিশ্বাসরোধকারী আবহাওয়া, স্নেহহীন দয়াহীন, মানুষের অপমান লজ্জা পাপ ও আত্মগ্লানিতে এখানকার দেয়ালগুলি পর্য্যন্ত ভয়ঙ্কর—ভবেশের বুকের ভিতরটা ধক্ ধক্ করিতে লাগিল। সারা জগতের বর্ব্বরতা, অন্যায়, উৎপীড়ন, অবিচার, লোভ ও লালসার কেন্দ্রীভূত মূর্ত্তি কি এই স্থান? এখানে আসিয়া প্রবেশ করিলে কি সত্যই জানা যায়, মানুষ এখনও সভ্য এবং ভদ্র হয় নাই? এখনও তাহাদের অন্তরে বন্য হিংস্রতা, আদিম প্রবৃত্তির ভয়াবহ রূপ, আত্মঘাতী নিষ্ঠুরতার বীভৎস চেহারা?

ঘণ্টার পর ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। প্রমীলার সহিত নির্দ্দিষ্ট সময় আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। ইচ্ছা হইল এই পাথরের দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া সে আত্মহত্যা করে, নিজের হাত কামড়াইয়া খান্ খান্ করিয়া ফেলে, চীৎকার করিয়া এই অপমানকর পুলিশ-প্রাসাদকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেয়।

এমন সময় স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সদলবলে আসিলেন। বন্দীর

ডাক পড়িল, ভবেশ দরজার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেট মাতৃ-ভাষায় কহিলেন, 'আপনাকে তখন খানাতল্লাসী করা হয়নি।' বলিয়া হাসিলেন।

দরজা খুলিয়া দিতেই ভবেশ কহিল, 'দয়া করে' এখনই করুন, করে' আপাততঃ আমায় রেহাই দিন্।' বলিয়া সে আর একবার ঘড়ির দিকে তাকাইল।

পাশেই একজন বাঙালী পুলিশ-অফিসার আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বলিলেন, 'আপনার নাম ঠিকানা নিয়ে আমরা কল্‌কাতায় টেলিফোন্ করেছিলাম—'

ভবেশ কহিল, 'ফললাভ কি হলো ?'

তাহার বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া এই উচ্চপদস্থ বাঙালীটি হাসিয়া ফেলিলেন। ভবেশ পুনরায় কহিল, 'খুলে দেখাবো নাকি সব ?'

'না, আপনি নির্ব্বিকার হয়ে দাঁড়ান্, আমরা একবার,—এটা নিয়ম কিনা পুলিশের, কিছু মনে করবেন না।'

তন্ন তন্ন করিয়া তাহার জামা কাপড় জুতো মোজা সমস্ত খানাতল্লাসী করা হইল। কেবল জামার ভিতর হইতে বাহির হইল একখানা চিঠি, এক প্যাকেট্ চকোলেট্, একতাড়া নোট্, গোটা দুই আলপিন্, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের একখানা চেক-বই, এক টুক্‌রো পাঁউরুটি, একটা দামী ফাউন্টেন্ পেন্। প্রথমে নোটগুলি গোণা হইল, দুইশত ঊনষাট টাকা সাড়ে নয় আনা। তারপর চিঠিখানি। খামখানা নাই, শুধু চিঠি।

কোনো ঠিকানা বা তারিখ ছিল না। পত্রখানি প্রমীলার শেষ পত্র। পড়িয়া বাঙালী সাহেবটি একবার মুখ চাওয়াচায়ি করিলেন। তারপর বলিলেন, 'বুঝলাম আপনার সঙ্গে এঁর সম্পর্ক, ইনি কি বিবাহিত ?'

জিনিস পত্র, টাকা ও চিঠি ফিরাইয়া লইয়া যথাস্থানে রাখিতে রাখিতে উত্যক্ত হইয়া সে কহিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, বিবাহিত এবং বিধবা।'

'প্রমাণ ?'

'আমার সঙ্গে গেলেই—' বলিয়া ভবেশ আবার ঘড়ির দিকে তাকাইল।

বাস্ ওই পর্য্যন্তই। পুলিশের সন্দেহ আর রহিল না. ভবেশ ছাড়া পাইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আবার একটা বিবৃতি তাহাকে দিতে হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট হাসিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। একবার পরস্পরের করমর্দ্দনও হইয়া গেল।

বিদায় লইয়া বাহিরে আসিতেই সেই বাঙালী পদস্থ কর্ম্মচারীটি কহিলেন, 'আপনাকে ঠিক বোঝা গেল না, এ কি সত্যি ? এতখানি দুস্প্রবৃত্তি আপনার ? ভদ্র ঘরের মেয়েদের সঙ্গে এমনি—'

'আর একবার গ্রেপ্তার করবেন নাকি ? দুর্নীতির অপরাধে ?'

লোকটি চুপ করিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিল, 'হয়ত আর একবার ব্যভিচারের চার্জ্জে পড়বেন। সেদিন—'

ভবেশ হাসিয়া চলিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল, 'সেদিন আশা করি আপনার সঙ্গে দেখা হবে।'

লোকটি তাহার পথের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মনে হইল ভিতরে ভিতরে কোথায় তাহার একটা অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে।

ছুটিতে ছুটিতে লাহোরী গেট্‌এর কাছে আসিয়া ভবেশ হাঁপাইতে লাগিল। চঞ্চল চকিত চোখে এদিক ওদিক তাকাইয়া গাড়ী খুঁজিতে লাগিল। বেলা সাড়ে তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, এখান হইতে কুতব-মিনার এগারো মাইল পথ। খানকয়েক মোটর-বাস দাঁড়াইয়া কুতবের যাত্রীর জন্য হাঁকাহাঁকি করিতেছিল। তাহারা পথে যাত্রী উঠাইয়া নামাইয়া চলিবে, অনেক দেরী হইয়া যাইবে।

অবশেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর একখানা মোটর মিলিয়া গেল। ভাড়াটে মোটর। দরদস্তুর করিবার সময় ছিল না, গাড়ীতে উঠিয়া সে কহিল, 'চালাও, কুতব-মিনার।'

'আচ্ছা বাবুজি।' বলিয়া ড্রাইভার গাড়ী চালাইল।

আরাবল্লী পাহাড়ের ক্ষীণ একটা রেখা পথের ধারে বহুদূর হইতে আসিয়া মিলিয়াছে। সূর্য্যের খরকিরণ স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল। যে পথটা রাইসিনার দিকে সোজা পুল পার

হইয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই পথ দিয়া গাড়ী ছুটিল; বাঁ দিকে রহিল জীর্ণ ও পুরাতন দিল্লীর দুর্গ-প্রাকার। দুর্গের মধ্যে লোকালয় দেখা যাইতেছিল।

গাড়ী ছুটিতেছে। ভবেশ কহিল, 'জল্‌দি, জল্‌দি চালাও, ইনাম মিল যায়েঙ্গে।'

'মেহেরবানী বাবুজি।' বলিয়া ড্রাইভার আরো গতি বাড়াইয়া দিল। বেলা চারটে বাজিতে কয়েক মিনিট মাত্র আর বাকি আছে।

কিন্তু জোরে চালাইতে গিয়া পথের একটা পুলিশ হাঁ হাঁ করিয়া পিছন দিক্ হইতে চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু তখন আর থামায় কে? মুখ বাড়াইয়া ভবেশ দেখিতে পাইল, কন্‌স্টেবলটা গাড়ীর নম্বর টুকিয়া লইতেছে। উত্তেজিত হইয়া ভবেশ কহিল, 'কই পরোয়া নেই, আওর জোরসে চালাও, হাম তুমারা জরিমানা দে দেঙ্গে—চালাও।'

গাড়ীর গতি দ্রুততর হইল। পথ প্রান্তর দূরে দূরে মিলাইয়া যাইতেছে, জনহীন বিশাল শস্যশূন্য প্রান্তরের উপর ভগ্ন ও প্রাচীন হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ ও দিল্লীর চিহ্ন বিদ্যমান। পিছনের নূতন শহর একটু একটু করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। যমুনা নদী ইহাদেরই ওপারে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। আকাশে মেঘের গায়ে একটু একটু করিয়া রঙ ধরিতে লাগিল, রৌদ্রের আলো স্তিমিত, বাতাসে ধূলি ও জঞ্জাল উড়িয়া দু'ধারের পথ আর দেখা যাইতেছিল না।

এমনি করিয়া পথ ফুরাইল। দক্ষিণে বাঁক লইতেই কিছু-দূরে কুতবমিনারের চূড়া বাহির হইয়া পড়িল, মানুষের সমাগম দেখা গেল, দুই একখানা সরকারি বাড়ী পার হইল।

গাড়ী আসিয়া গেট্‌এর কাছে ঝাঁকানি দিয়া থামিল। ভবেশ নামিয়া পড়িয়া কহিল, 'ঠারো হিঁয়া, ফিন্ ফিরতি যায়েগা।' বলিয়া কিছু পয়সা বাহির করিয়া ড্রাইভারকে দিয়া পুনরায় কহিল 'জলপানি লেও।'

সুন্দর পরিচ্ছন্ন উদ্যান, আশে পাশে প্রস্তরময় নানা কীর্ত্তি-কলাপ। ওধারে আলাউদ্দিনের অসমাপ্ত কীর্ত্তি। সম্মুখে গগনস্পর্শী কুতবমিনার, ভাস্কর্য্যের অপূর্ব্ব অবদান, লাল রং। ভিতরে ঢুকিয়া ভবেশ আপন চাঞ্চল্যকে দমন করিয়া বাহিরে এই ঐতিহাসিক বস্তুগুলির তারিফ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মিথ্যা নয়, মিথ্যা নয়, স্বপ্ন ও মায়া নয়, চক্ষু তাহাকে প্রতারণা করিতেছে না, এখনও সে অচেতন হয় নাই, সে মাতাল নয়, উন্মাদ নয়,—প্রমীলা দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে। একবার দৃষ্টি-বিনিময় করিয়া ভবেশ অন্যদিকে ফিরিয়া উদাসীন হইয়া গেল। প্রমীলার সহিত একটি গণ্যমান্য ভদ্রলোক, দুইটি মহিলা, ইহাদের একজনকে ভবেশ লক্ষ্ণৌতে দেখিয়াছে, এবং তাহাদের পাশে প্রমীলার হাত ধরিয়া একটি সুশ্রী বালক। যথেষ্টই ইহারা অবস্থাপন্ন বলিয়া ভবেশের ধারণা হইল। লোকটি গুরুগম্ভীর সন্দেহ নাই। বিদেশে স্বজাতির সহিত পাছে সহজেই পরিচয় হয়, এজন্য ভবেশ আপন

গাম্ভীর্য্য ও ঔদাসীন্য রক্ষা করিয়া নির্লিপ্ত ভাবে দূরে দূরেই রহিল।

ভদ্রলোকটি কহিলেন, 'উঠতে নামতে দেরি হবে, বেলা পড়ে এল, এসো উঠি।'

মেয়েরা কহিল, 'আজকে থাক্ আর একদিন বরং—'

প্রমীলা কহিল, 'আজকে থাক্ কেন ? ভারি যে সখ ! রোজ রোজ তোমাদের আনবেই বা কে ? ছোট মামার অত সময় নেই।'

ছোট মামা হাসিয়া কহিলেন, 'বাস্তবিক, প্রমীলা আমাকে ঠিক বোঝে।'

'তবে চলুন। তুমি এসো ঠাকুরঝি ?'

'না ভাই, আমি সেবারে এসে একবার উঠেছিলাম, আর নয়। তোমরা গিয়ে ওঠো, আমি নীচে দাঁড়াই। শরীরটা আমার আজ ভালো নেই।' বলিয়া সে তাহার বিবর্ণ মুখখানা অন্যদিকে ফিরাইল।

ছোট মামা ও মামী অনুরোধ করিলেন, কিন্তু প্রমীলা রাজি হইল না। ছোট ছেলেটিও অত সিঁড়ি ভাঙিয়া উঠিতে অক্ষম সুতরাং তাহাকে লইয়া প্রমীলা নীচে দাঁড়াইয়া রহিল। আর সকলে ভিতরে ঢুকিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতে সুরু করিলেন।

যাক্, অন্ততঃ কুড়ি মিনিট সময় পাওয়া যাইবে। পা দুইটা প্রমীলার ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে, যে মিথ্যাচরণ সে অক্লেশে করিয়া বসিল, তাহার আবেগে এখনই হয়ত মাটিতে পড়িয়া

যাইতে পারে। বালকটির হাত ধরিয়া খানিকক্ষণ এদিক ওদিক করিয়া সে কহিল, "পিণ্টু, ওইখানে গিয়ে নিজের মনে তুমি খেলা করগে ত ভাই, আমি আবার যখন ডাকব তখন এসো, কেমন? লক্ষ্মিটি!' বলিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া গভীর করিয়া মুখে চুম্বন করিয়া আবার ছাড়িয়া দিল।

'তুমি না ডাকলে আমি আসবো কিন্তু, তা বলচি।' বলিয়া পিণ্টু তাহার স্নেহময়ী মাতৃসমা দিদিটিকে একটু শাসন করিয়া দৌড়াইয়া চোখের আড়ালে চলিয়া গেল।

এক-পা এক-পা করিয়া প্রমীলা একটা পাথরের পাঁচিলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। ভবেশ তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। প্রমীলা ভীত ত্রস্ত চোখে একবার পিণ্টুর পথের দিকে ও মিনারের উপরের বারান্দার দিকে তাকাইয়া কহিল, 'এত দেরী হলো তোমার আসতে?'—বলিতে বলিতে সে আবেগে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ভবেশ হাসিয়া কহিল, 'পুলিশে আমাকে গ্রেপ্তার করেছিল প্রমীলা, এইমাত্র ছাড়া পেয়ে—'

'গ্রেপ্তার করেছিল? কষ্ট দেয়নি ত? ওকি, তোমার কপালে রক্ত কেন?'

কপালে হাত দিয়া রক্ত দেখিয়া ভবেশ কহিল, 'ও কিছু না, গাড়ীর ঝাঁকুনিতে এক সময় মাথা ঠুকে গিয়ে,—কেমন আছ তুমি প্রমীলা?'

প্রমীলা আবার সকল দিকে তাকাইল। তাকাইয়া কহিল,

'সব জানাজানি হয়ে গেছে, লজ্জা আর অপমান, যে কলঙ্ক রটেচে তা হয়ত একদিন থেমে যাবে কিন্তু তার গ্লানি......... আমাকে সবাই বিশ্বাস করত, এ আমি সইতে পারব না।' গলা তাহার রুদ্ধ হইয়া আসিল।

'কি করতে চাও এখন প্রমীলা?'

'তুমি বলে দাও, তুমি বল, কি রইল আমার? এর নাম বাঁচা? লোকের সন্দেহ নিয়ে, অবিশ্বাস নিয়ে—'

ভবেশ কহিল, 'তোমাকে আমি নিতে এসেছি, যাবে?'

প্রমীলা কাঁপিয়া উঠিল। পিছনে তাহার আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু, সমাজ, হিতাকাঙ্ক্ষী সবাই যেন অকস্মাৎ হাত বাড়াইয়া তাহাকে সবলে টানিয়া ধরিল। পিণ্টু যেদিকে গিয়াছে সেই-দিকে অচেতন দৃষ্টিতে সে একবার তাকাইল, কথা ফুটিল না।

'যাবে প্রমীলা, বল যাবে কি না?'

মুখ তুলিয়া প্রমীলা কহিল, 'কোথায় যাবো?'

'আমি যাবো যেখানে, তুমিও যাবে। দু'জনেই বাঁচাবো দু'জনকে। তোমার অসম্মান হয় এমন পথ আমি ধরবো না। আমি তোমাকে বিবাহ করব প্রমীলা। বিয়ে করলেই একদিন আমাদের সকল লজ্জা, সকল গ্লানি মুছে যাবে।'

'কিন্তু—'

'এর আর কিন্তু নেই প্রমীলা। আমার জীবনে মৃত্যু এনে দিও না, আমাকে ভিক্ষা দাও। যাবে প্রমীলা? গাড়ী এনে রেখেছি, এসো।'

'তবে তুমি গাড়ীতে গিয়ে ওঠো, আমি আসচি।'

ভবেশ দ্রুতপদে চলিয়া যাইবার পর, সরিয়া আসিয়া প্রমীলা গলা বাড়াইয়া ডাকিল, 'পিণ্টু?'

পিণ্টু কোথায় লুকাইয়া ছিল, অমনি সাড়া দিয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া হাজির হইল। বলিল, 'দিদি, তুমি এত দেরী করলে কেন ডাকতে?'

প্রমীলা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া আদর করিয়া চোখের জলে তাহার মুখের উপর মুখ রাখিয়া কিয়ৎক্ষণ স্থির হইয়া রহিল। একবার তাহার ওষ্ঠাধরে নিবিড় চুম্বন করিল। সে-চুম্বনে সে তাহার স্নেহ, দাক্ষিণ্য, আশীর্ব্বাদ, শুভেচ্ছা সমস্ত তাহার সকল আত্মীয়-স্বজনের জন্য রাখিয়া দিল।

'আমি যদি মরে যাই পিণ্টু, তুমি কাঁদবে?'

পিণ্টু তাহারই স্নেহে, তাহারই শিক্ষায় মানুষ হইয়াছে। বলিল, 'না।'

প্রমীলা হাসিয়া তাহাকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া একবার উপরের দিকে চাহিল, দেখিল এখনও তাহার মামা-মামী ও বৌদিদি চূড়ায় উঠিতে পারেন নাই। সে নিশ্চিন্ত হইয়া কহিল, পিণ্টু, দাঁড়াও ত ভাই এখানে, একটু জল খেয়ে আসি।'

'শিগ্‌গির এসো কিন্তু।'

'যদি দেরি হয় কোথাও যেন যেও না। হ্যাঁ, এই কাগজটা তোমার কাছে রেখে দাও, বাড়ী গিয়ে তোমার বাবার হাতে দিও, কেমন?'

'আচ্ছা।' পিণ্টু কহিল।

'যদি আসতে দেরি হয়, কাঁদবে না ত?'

এবার পিণ্টুর ধারণা হইল দিদি তাহার সহিত রসিকতা করিতেছে। হাসিয়া কহিল, 'ধ্যেৎ, জল খেতে গেছ, কাঁদব কেন? চুপটি করে এখানে দাঁড়িয়ে থাকব। এই ছাখো।'

দিদিকে মিলিটারি কায়দা দেখাইয়া সিপাহীর মত করিয়া সে হাসিতে হাসিতে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রমীলা হাসিয়া চোখের জল চাপিয়া আর কোনোদিকে না তাকাইয়া দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া আসিল।

মোটরে বসিয়া ভবেশ ক্ষণে ক্ষণে অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। প্রমীলা বাহিরে আসিতেই সে গাড়ীর দরজাটা খুলিয়া হাসিয়া তাহাকে তুলিয়া লইল, এবং অপরিচিত গাড়োয়ানের কাছে কোনো চাঞ্চল্য ও আবেগ প্রকাশ না করিয়া সহজ ও স্বাভাবিক কণ্ঠে কহিল, 'চালাও, জল্‌দি চলো, আঁধেয়ার হো আয়া।'

প্রমীলা এতক্ষণে তাহার দিকে মুখ তুলিয়া একান্ত দৃষ্টিতে তাকাইয়া সস্নেহ কণ্ঠে কহিল, 'কত কষ্টই পেয়েছ সারাদিন! দেখি কপালটা কতখানি কাট্‌ল?'

গাড়ী তখন হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। ভবেশ কহিল, 'ও কিছু না, অমন হয়।'

'তোমাকে আমি একলা পাব একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। কী অবস্থায় এ ক'দিন কেটেছে তোমাকে বোঝাতে পারব না। মুখের দিকে তাকিয়ে আছ যে?'

ভবেশ মুখ ফিরাইয়া হাসিল। প্রমীলা তাহার হাত ধরিয়া কহিল, 'বল কেন হাসচ ? বল ?'

ভবেশ কহিল, 'আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তুমি সেই প্রমীলা ? চোখ বুজে ভাব ত সমস্ত ভারতবর্ষটা ? কোথায় কোথায় আমরা পায়ের দাগ রেখে এসেছি মনে কর ত ?'

প্রমীলা কহিল, 'পায়ের দাগ নেই শুধু প্রথম যেখানে দেখা হয়েছিল। সমুদ্রের বালির চড়ায় ঢেউ এসে সে দাগ ধুয়ে নিয়ে গেছে !'

কয়েক মাইল পথ আসিয়া ভবেশ কহিল, 'ওরা খুঁজতে বেরুবে ত তোমাকে ?'

খুঁজবে অনেক রাতে, এখন আর নয়। পিণ্টুর হাতে চিঠিতে লিখে এলাম, 'পথ চিনে বাড়ী যাচ্ছি, চেনা গাড়োয়ান, ঠিক নিয়ে যাবে। আপনারা যাবার সময় পিসিমার ওখানে নেমন্তন্ন সেরে যাবেন। হঠাৎ মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হয়ে আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না।'

'তোমার বুদ্ধি অদ্ভুত, এমন আমি কোথাও দেখিনি। কিন্তু তারপর ? তুমি কি জানতে আমি তোমাকে নিতেই আসচি ?'

'জানতাম। আমার ও চিঠি পেয়ে কোনো পুরুষই আর নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারত না। জানতাম বলেই বাড়ীতে আমার বিছানার নীচে শেষ চিঠি লিখে এসেছি।'

'কি লিখলে ?'

'লিখলাম, খোঁজবার চেষ্টা করবেন না, ভেবে চিন্তেই যাচ্ছি। আত্মীয়-স্বজনের অসম্মান হয় এমন কাজ আমি করব না, নিজের চরিত্রকে আমি জানি। আমি একলা নই, সঙ্গে যিনি রইলেন তিনি মানুষ। একদিন আমি নিজেই খবর দেবো যে, ভাল আছি। যে পথে যাচ্ছি সে পথে মানুষ বাঁচে, মরে না। চিঠি খুব ছোট।'

ক্রমে পথ ফুরাইল। রাইসিনার পথে পথে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। একটু একটু করিয়া সন্ধ্যা ঘনাইয়া উঠিল।

প্রমীলা কহিল, 'এতক্ষণে ওরাও বোধ হয় পথে আসচে। দেখো যেন আর দেখা হয়ে যায় না!'

'ধরো যদি হয়?'

'না, সে ভাল নয়। যে মরে গেছে জানি, যার জন্যে কান্না-কাটি করে নিশ্চিন্ত হয়েছি, সে আবার বেঁচে উঠে এলে বড় বিপদ!'

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করিল, 'আব্ কিধার বাবুজি?'

'ষ্টেশনে চলো।'

কিন্তু ষ্টেশনের পথে কিছুদূর আসিয়া হঠাৎ এক জায়গায় ঝাঁকানি দিয়া গাড়ীখানা থামিয়া গেল।

প্রমীলা কহিল, 'বাঁয়ে কিনারে গাড়ী রাখ্না। পেট্রল লেগা কেয়া?'

'নেই মাজি, গাড়ী বিগড় গিয়া।' বলিয়া ড্রাইভার নামিয়া সুমুখের লোহার চাকা খুলিয়া গাড়ী পরীক্ষা করিতে

লাগিল। মিনিট কয়েক পরীক্ষার পর ব্যস্ত হইয়া ভবেশ গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল, বলিল, 'তুম্ গাড়ী ঠিক করো, হামলোক চল্‌তা হ্যায়।' বলিয়া পকেট হইতে দুইখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া সে তাহার হাতে দিল। ড্রাই-ভার কৃতজ্ঞচিত্তে সেলাম করিয়া তাহাদের বিদায় দিল।

সর্ব্বাঙ্গে চাদর মুড়ি দিয়া প্রমীলা তাহার পাশে পাশে চলিল। কিছুদূর গিয়া একখানা টাঙা ভাড়া করিয়া ভবেশ তাহাকে বসাইয়া কহিল, 'কোনো ভাবনা নেই, কোন জিনিস-পত্র এখান থেকে কিনে নিই, এই যে বেশ বড় দোকান। মিনিট পাঁচেক লাগবে।'

'কেন এত খরচ করচ, মিথ্যে মিথ্যে—'

'তা হোক, আজ আমাকে কিছুতে বাধা দিও না প্রমীলা। দাঁড়াও আসচি।' বলিয়া ভবেশ চলিয়া গেল।

মিনিট কয়েক পরে জিনিস-পত্রের বড় একটা মোট লইয়া সে ফিরিয়া আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। বলিল, 'বেশ বুঝলাম, বেটা তাড়াতাড়িতে ঠকালে,—চলো ষ্টেশন্, জল্‌দি। রাত ন'টায় একটা গাড়ী আছে প্রমীলা।'

'কোথাকার?'

'কল্‌কাতার দিকে যাবে।'

'কল্‌কাতা? অনেক চেনা লোকজন আছে যে!'

ভবেশ হাসিয়া কহিল, 'সবাই কি আর আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছে? তা ছাড়া আমরা ত কোনো অন্যায় করিনি?'

প্রমীলাও হাসিল। বলিল, 'একটা মেয়েকে ঘর থেকে ছিঁড়ে নিয়ে পালাচ্ছ, এ বুঝি অন্যায় নয় ?'

'এটা ত দৈনিক কাগজের সংবাদ, এটা ত শুধু ঘটনা।'

'ঘটনাই লোকের চোখে বড়, সাধারণ মানুষের তলিয়ে ভাববার বিদ্যেও নেই, সময়ও নেই। সাধারণ মানুষ চায় সংবাদ।'

স্টেশনে আসিয়া আগে তাহারা একটা ওয়েটিং-রুমে ঢুকিল। ভিতরে লোকজন কেহ নাই, আসিবার সম্ভাবনাও ছিল না, মাথার উপরে ইলেক্‌ট্রিক আলোয় ঘরখানা আলোকিত। জিনিসপত্রের বড় বাণ্ডিলটা ভবেশ টেব্‌লের উপর রাখিয়া হাঁপ ছাড়িল। হাসিয়া বলিল, 'আজ সকালে এই ঘরটা থেকেই আমাকে গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু এখন ?'

প্রমীলা হাসিয়া কহিল, 'এখন তুমি কেল্লা জয় করে ফিরেছ !'

ভবেশ এবার অকস্মাৎ আনন্দে বিহ্বল হইয়া তাহার দিকে সরিয়া গেল, কিন্তু মাঝপথেই থমকিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'এখন না, আগে একটা কথা রাখো।' বলিয়া বাণ্ডিল খুলিয়া একখানা রেশমি শাড়ী, সেমিজ, পেটিকোট্‌ ও ব্লাউস বাহির করিয়া বলিল, 'থান কাপড় পরে নিজেকে আর অপমান ক'রো না প্রমীলা, ওই যে বাথ্‌রুম, আগে গিয়ে কাপড় ছেড়ে এসো।'

'এ তোমার ভারি ছেলে মানুষী কিন্তু, এতদিন পরে আমার বুঝি লজ্জা করে না ? কেন বাপু, এই ত বেশ— সাদা কাপড়—'

তবু তাহাকে যাইতেই হইল, এবং কাপড়ও ছাড়িয়া আসিতে হইল। দরজা খুলিয়া বাহির হইতেই অকস্মাৎ ভবেশের সমস্ত দৃষ্টির সকল পরদা খুলিয়া গেল। মুখে তাহার লজ্জার হাসি, চোখে আনন্দাশ্রু, সর্ব্বাঙ্গের নিখুঁত গঠন-সৌষ্ঠব, মাথায় সামান্য একটু ঘোমটা, পায়ে জড়িত লজ্জা,—লাবণ্য এবং লালিত্যের সোনার প্রতিমা। ভবেশ কাছে গিয়া তাহার হাত টানিয়া দুই হাতে চার গাছি সোনার চুড়ি পরাইতে পরাইতে কহিল, 'সর্বেশ্বর ঘটককে যখন খানাতল্লাসী করছিল, ব্যাটারা ভাখেনি, তার আন্ডার-ওয়ারের পকেটে ছিল সোনার চুড়ি, এ চুড়ি আগে ছোঁবার সৌভাগ্য তাদের হবে কেন?' বলিয়া সে প্রমীলার হাত দুইখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তৃপ্ত চক্ষে একবার দেখিয়া লইল। তারপর টেব্‌লের উপর হইতে মখ্‌মলের এক-জোড়া চটি লইয়া সে প্রমীলার পায়ে পরাইয়া দিতে বসিয়া গেল।

প্রমীলা কহিল, 'বাধা দেবো না, দিলেও তুমি মানবে না, যা খুসি তাই করে নাও। কী পাগল তুমি বল ত?'

জুতা পরাইয়া সে প্রমীলাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিল। বলিল, 'এই কি আমাদের বিয়ে নয় প্রমীলা?'

প্রমীলা কহিল, 'না, এখনও একটু বাকি আছে।' বলিয়া হাসিয়া সে তাহার হাতের হীরার আংটি খুলিয়া ভবেশের ডান হাতের আঙুলে পরাইয়া দিল এবং তারপর গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা তুলিয়া মাথায় লইল। বলিল, 'এই ধূলো হোক আমার সিঁথের সিঁদূর।'

দুই হাতে ভবেশ তাহার মুখখানি তুলিয়া আলোর দিকে ধরিল, দেখিতে দেখিতে পাগলের মত এক সময় সে হাসিয়া উঠিল। হাসিয়া সে অস্থির হইল, ছুটিয়া বেড়াইল, ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আসিয়া দাঁড়াইল। কুলায় যেমন সন্ধ্যার ক্লান্ত পাখী আশ্রয় নেয়, তেমনি করিয়া প্রমীলা তাহার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইল। তাহার চক্ষে জল টল্ টল্ করিতেছিল।

এমন সময় দরজার কাছে দাঁড়াইয়া হাঁক দিয়া আরদালি কহিল, 'বাবুজি, বাবুসাহেব, গাড়ী আ গিয়া, জল্‌দি করো।'

অনেক চেষ্টা করিয়া একখানা ছোট সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী রিসার্ভ করা হইল। মোগলসরাই পর্য্যন্ত টিকেট। গাড়ীতে উঠিবার সময় ভবেশ একখানা টেলিগ্রাম গিরীশের নামে পাঠাইয়া দিল। মোট-ঘাট নাই বলিয়া ঝঞ্ঝাটও কিছু ছিল না। গাড়ীতে উঠিয়া তাহারা সম্মুখে প্লাট্‌ফরমের দিকের জানালা কয়টা বন্ধ করিয়া দিল। বাহিরের জগতের সহিত আর তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। একটা বয় আসিয়া তাহাদের খাবার দিয়া গিয়াছে, রেস্টুরেন্ট-কার-এর লোক, পথে কোনো ষ্টেশনে সে তাহার ডিসগুলি এবং টাকা লইয়া যাইবে। আপাততঃ নিশ্চিন্ত।

'দেশে গিয়ে তোমার থান কাপড় আর জামা এখানকার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবো, কি বল ?'

'এতদিনের প্রতিশোধ বুঝি ?'

ভবেশ কহিল, 'প্রতিশোধ নয় বিদ্রূপ। এ বিদ্রূপের সুবিধেটা আমায় দিও প্রমীলা। আচ্ছা, চলে এসে তোমার মন-কেমন করচে না ?'

'করলে খুব স্বাভাবিক হতো, সচরাচরের মত হতো। শুধু মনে পড়চে পিণ্টু আমার অপেক্ষায় রয়েছে। বাড়ী গিয়ে খুঁজবে, রাতে এখন থেকে মা'র কাছেই শোবে,······কাঁদবে কিছুদিন, তারপর নিজেই শান্ত হবে। এমনি করেই সংসার চলে !' বলিয়া প্রমীলা বাহিরের দিকে তাকাইল।

ভবেশ তাহার পাশেই বসিয়া ছিল, প্রমীলা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, 'বাইরের লোকের একটু অসুবিধে হলো বটে—'

বাঁশী বাজাইয়া গাড়ী তখন ছাড়িয়া দিয়াছে।

'বাড়ীতে ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে একটা স্কুল করেছিলাম, আমারই কাছে সবাই পড়ত······সবাই গরীব। সকাল বেলা আমার কাছে এসে পাড়ার লোকেরা হোমিওপ্যাথী ওষুধ নিয়ে যেত, তাদের একটু অসুবিধে হলো বটে, এর পর থেকে পয়সা দিয়ে তারা ওষুধ কিনে আনবে। আমার হাত ছিল ভাঁড়ার, পয়সা কড়ির হিসেব, পাল-পার্ব্বণের ব্যবস্থা।'

ভবেশ কথা কহিতে পারিল না।

প্রমীলা কহিল, 'কিন্তু আমি ভাবচি 'দাদামশা'য়ের কথা।

বাবার মৃত্যুর সময় দাদামশাই আমাকে ভিক্ষে নিয়েছিলেন। বুড়ো মানুষ, প্রায় আশী বছর বয়স, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যার মত, আমি নৈলে তাঁর চলে না। আমি ছাড়া কবরেজি ওষুধ তিনি আর কারো হাতে খান্ না, রাতে আমার মুখে মহাভারত পড়া না শুনলে তাঁর কিছুতেই ঘুম আসবে না,—পিন্টুর শোনা চাই রাজকন্যার গল্প। ভগবান ওদের ব্যবস্থা করবেন।'

ভবেশ কহিল, 'বৃদ্ধের এ আঘাত হয়ত সইবে না।'

'হয়ত সইবে না, কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় কী ছিল? ঘর ছেড়ে পুরুষও পালায়, মেয়েও পালায়। কিন্তু মেয়ে মানুষ পালালে তার একটি ছাড়া আর দ্বিতীয় অর্থ তোমরা করতে পারো না। অথচ যে-মেয়ে কেবল দেহ-সম্ভোগের জন্যেই পথে নেমে আসে, আমি তাকে ঘৃণা করি।'

ভবেশ কহিল, 'আমিও তাকে ঘৃণা করি প্রমীলা, যে-পুরুষ শুধু ওই কারণেই মেয়ে মানুষকে টেনে আনে।'

অনেকক্ষণ এমনি করিয়া গল্প করিবার পর ভবেশ উঠিয়া জানালাগুলি আবার খুলিয়া দিল। হাওয়া আসিয়া প্রমীলার মাথার চুল উড়াইতে লাগিল। মাথার কাছে পাখা ঘুরিতেছে, আলো জ্বলিতেছে।

'সেই রেলের রাতটা তোমার মনে পড়ে প্রমীলা? এক-দিকে দিদিমা, আর একদিকে মাসি—সেদিনের কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে। অত বাধা ছিল বলেই আমাদের অত আগ্রহ।'

'তাই হয়, বাধা আর শাসন। শাসন ভাল যদি তার সঙ্গে পীড়ন না থাকে।'

'শাসন মানেই পীড়ন। মানুষকে শাসন করার অধিকার মানুষের নেই। অথচ এই সোজা কথাটা বুঝতে কত কষ্টই আমার হতো। এই সেদিনও আমি এসব সইতে পারতাম না, দুটি ছেলে-মেয়ে পরামর্শ করে পালিয়ে যাচ্ছে, তারা স্বামী-স্ত্রী নয়, এ ঘটনা শুনলে আমি শিউরে উঠতাম। বাইরের বস্তুটা চোখে পড়তো, বাইরেটাই বড়, ভিতরের কথাটা জানবার আমার ধৈর্য্য থাকতো না। দুর্নীতি কোথাও দেখলে রাতে আমার ঘুম হতো না। এমনি করেই বড় হয়েছি, এমনি করেই আমার দিন গেছে। বিবাহ যখন হলো তখন অপরিণত মন, সে বিবাহের মধ্যে সত্যকারের যৌবনের চেহারা আমি দেখিনি; তিনি যেদিন চলে গেলেন, সেইদিনই আমার মনে হলো পৃথিবী অনেক বড়, জীবনের অনেক বৈচিত্র্য। তারপর পেলাম তোমাকে সমুদ্র-তীরে। সে যে আমার কত বড় পাওয়া, মনে হলো অতীত জীবন একটি রাত্রেই আমার ধূলিসাৎ হয়ে গেল, নতুন জীবন সুরু হলো, বাঁচবার অধিকার কারো চেয়ে আমার কম নয়, সেদিন আমি আমার যৌবনের চেহারা স্পষ্ট করে চেয়ে দেখলাম। আঃ সে আমার কী দিন! তারপর তুমি চলে গেলে, স্বপ্নের মত এলে, ছায়াবাজির মত মিলিয়ে গেল। ঘুম ভাঙ্‌লো। ভাবলাম, জীবনের মত এত বড় অর্থহীন বস্তু আর কিছু নেই। পথেই হলো আমার বাসা, তোমায় খুঁজি সকল মানুষের মধ্যে।

প্রমীলা, জানি সে আমার বিরহের ব্যথা কিন্তু সে যে যন্ত্রণা, সে যে কঠিন পীড়ন, সে বিরহের মধ্যে রসের গভীর আনন্দ নেই, আছে ভয়ানক একটা জ্বালা। তোমার চিঠি পেয়ে মনে হতো দেয়ালে-দেয়ালে মাথা ঠুকে আমার দাবি সকলের কাছে জানাই। কিন্তু কে শুন্‌বে বল? গঙ্গার তীরে চাঁদের আলোয় ক্ষুধার্ত্ত প্রেতের মত ঘুরতাম। বলতাম, নদী, তুমি শুনে যাও আমি কা'কে চাই! চন্দ্র, তুমি জানো, কে আমার নিভৃত রাত্রের এক-মাত্র তপস্যা! প্রমীলা সে দুঃখের ভাষা নেই, বর্ণনা নেই।' বলিতে বলিতে দুই হাতের মধ্যে ভবেশ তাহাকে টানিয়া লইল।

প্রমীলা সাশ্রুনেত্রে মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে হাসিতেছিল; ভবেশ তাহার চোখের উপর চোখ রাখিয়া কহিল, 'আমার মনের রঙ দিয়ে, রস দিয়ে, রূপ দিয়ে তিল তিল করে তোমায় গড়েছি, তুমি আমার সোনার প্রতিমা, তিলোত্তমা। তোমার সর্ব্বাঙ্গে আছে আমার স্বপ্ন, আমার কল্পনা, আমার দুর্জ্জয় আনন্দের—'

তাহার চক্ষু দুরন্ত উল্লাসে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল। কঠিন লৌহময় বাহু দিয়া সে প্রমীলাকে জড়াইয়া ধরিল, মুখের কাছে মুখ আনিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, 'প্রমীলা, তুমি কাঁপচ কেন বল ত?'

প্রমীলার চক্ষু দুইটি অপরিমিত তৃপ্তিতে জড়াইয়া আসিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল তাহার সর্ব্বদেহের উত্তাল উন্মাদ রক্ত-প্রবাহে সুরার মত ভবেশের কথাগুলি মিলিয়া মিশিয়া

একাকার হইতেছে। অস্ফুট কম্পিত কণ্ঠে সে শুধু কহিল, 'কি বল্‌ব বলে দাও?'

এমন সময় একটা ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিল। প্রমীলা সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, 'রাত কত হলো?'

হাত-ঘড়িতে সময় দেখিয়া ভবেশ বলিল, 'বারোটা বাজে।'

মিনিট দুই পরে সেই আরদালিটা আসিয়া খাওয়া হইয়াছে কিনা খোঁজ লইল। কিন্তু তখনও আহারাদি হয় নাই, ভবেশ বলিয়া দিল, সকাল বেলা সে যেন তাহার বাসন ও পয়সা লইয়া যায়। ঘাড় নাড়িয়া সে চলিয়া গেল।

আহারাদি শেষ করিতে একটা বাজিল। ভবেশ কহিল, 'থাক্ আজ রাতে আর ঘুম হবে না।'

প্রমীলা হাসিয়া কহিল, 'ঘুম হবে না আমার, কারণ আমার হ'য়েছে আনন্দ। তোমার ঘুম হবে তৃপ্তিতে।'

ভবেশ হো হো করিয়া হাসিয়া ঘর ভাসাইয়া দিল। বলিল, 'এ যে সেই তৃপ্তি, যে-তৃপ্তিতে মানুষের আহার-নিদ্রা চলে যায়!'

'তোমার সবই অদ্ভুত।' বলিয়া কতকগুলি আঙুরের বোঁটা ছাড়াইয়া প্রমীলা তাহার হাতে দিল।

'আমার জন্যে তোমার কপালে একটা দাগ থেকে গেল।'

ভবেশ কহিল, 'আজকের দিনের চিহ্ন। সব চেয়ে বড় দান বিধাতার কাছে যেদিন পেলাম, রক্ত দিয়ে সেদিন তাঁর ঋণ শোধ করতে হলো।'

দুই হাত তুলিয়া মাথার চুল গুছাইয়া বাঁধিতে বাঁধিতে প্রমীলা কহিল, 'তাহলে আমিও মাথা ঠুকে রক্তপাত করি।'

দ্রুতগতির দোলায় গাড়ীখানা দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। রজনীর গভীর অন্ধকারে বাহিরে কোথাও কিছু দেখা যাইতেছিল না, জনহীন প্রান্তরের পারে মাঝে মাঝে আলেয়ার আলো জ্বলিয়া উঠিতেছে। আকাশে চন্দ্র এবং তারকার চিহ্নমাত্র নাই, বোধ করি মেঘাচ্ছন্ন। বাতাসের শব্দ এবং গাড়ীর লোহার চাকার আর্ত্তনাদে কানে তালা লাগিয়া যাইতেছিল।

'সারাদিন এত ছুটোছুটি, একটুও ঘুমোবে না? শরীর খারাপ হবে যে?'

ভবেশ কহিল, 'আগে তুমি ঘুমোও।'

'আমি?' হাসিমুখে প্রমীলা কহিল, 'বেশ যা হোক্। না, আগে তুমি।'

'না আগে তুমি।'

'আচ্ছা দু'জনেই একসঙ্গে, কেমন? দু'জনে দু' বেঞ্চিতে।'

'আচ্ছা।'

দুই ধারের দুই বেঞ্চিতে দুইজনে শুইয়া শিষ্ট ও শান্তর মত চোখ বুজিল। চোখ বুজিয়া অকাতরে ঘুমাইয়া পড়িল।

'ওকি, দুষ্টু, চোখ খুলেচ যে?'

'তুমি খুলেচ কেন আগে?'

'আগে খুলেছ তুমি, নৈলে আমি দেখতে পেলাম কি করে?'

'আচ্ছা এই বুজলাম।'

'আমিও বুজলাম তবে।'

আবার তাহারা নাক ডাকাইয়া গভীর নিদ্রায় ডুবিয়া গেল। কিয়ংক্ষণ পরে ভবেশ কহিল, 'বালিশ নেই, ঘুম হবে কেন?'

'আমার কি বালিশ আছে নাকি?'

'তোমার খোঁপা আছে যে?'

প্রমীলা হাসিয়া ফেলিল। বলিল, 'শুন্‌বে না, কেমন? বুঝতে পেরেছি। এসো, উঠে এসো।'

ভবেশ উঠিয়া আসিয়া তাহার কাছে বসিল। প্রমীলাও উঠিল, উঠিয়া তাহার মাথা টানিয়া কোলের উপর শোয়াইল, মুখের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে হাসিয়া কহিল, 'আয় চাঁদ, আয় আয়, সোনা-মাণিকের কপালে টিপ্‌ দিয়ে যা।'

একটা হাত বাড়াইয়া ভবেশ তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

'ওকি, দুষ্টু, গায়ে হাত দিলে আর বুঝি ঘুম হয়?'

হাত সরাইয়া লইয়া হাসিয়া ভবেশ আবার চোখ বুজিল।

দেখিতে দেখিতে সত্যই সে এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া তাহার মুখের ক্লান্তির রেখাগুলি ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। সে মুখখানি সুন্দর। দুইটি চোখের পল্লবগুলি যেন কালো ভ্রমরের মত বসিয়া বসিয়া অচেতন হইয়া রহিয়াছে। এই মসৃণ, পরিচ্ছন্ন, নধর মুখখানি, এই দীর্ঘ ঋজু দেহ, এই বলিষ্ঠ কঠিন বাহু, এবং সর্ব্বশেষে এই উদারচেতা সচ্চরিত্র কোমল-হৃদয় যুবকটিকে সে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি স্বপ্ন দেখিয়াছে। কত চিঠি, কত কথা, কত অশ্রু—কিছুতেই

ইহার প্রতি তাহার আকর্ষণ স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতে পারে নাই।

আদরে, স্নেহে, ভালবাসায় তাহার অবশ ও অচেতন মুখখানি ভবেশের মুখের উপর নত হইয়া আসিল। তাহার সমাজ, তাহার সংস্কার, তাহার পিণ্টু ও দাদামশাই, তাহার এতদিনের নির্ম্মল চরিত্র, তাহার আত্মসম্ভ্রম দৃঢ়তা, সংযম, তাহার ধর্ম্মপ্রবণতা ও নৈতিক চেতনা—রাত্রির এই নিঃশব্দ মুহূর্ত্তগুলির ফাঁক দিয়া কোথায় মিলাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। ভবেশের মুখের উপর মুখ রাখিয়া সে চুম্বন করিতে লাগিল, চুম্বন করিতে করিতে সে আর মুখ তুলিতে পারিল না, সংজ্ঞা রহিল না, চুলের রাশ ভাঙিয়া পড়িয়াছে, সরাইয়াও দিল না, অশ্রুজলে সিক্ত মুখখানি একান্ত নির্ভরতায় এই যুবকটির মুখের উপর স্থির হইয়া রহিল।

ভবেশ জাগিয়া উঠিল, কিন্তু সাড়া দিয়া জীবনের এই দুর্লভ মুহূর্ত্তগুলিকে বিচলিত করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না।

রাত্রি বিদীর্ণ করিয়া করিয়া হু হু শব্দে গাড়ী ছুটিতে লাগিল।

বিবাহের পর তাহাদের জীবনের উপর দিয়া প্রায় তিনটি বছর পার হইয়া গিয়াছে। তিনটি শীত, তিনটি বর্ষা এবং তিনটি বসন্ত। কলিকাতার বাসা ত্যাগ করিয়া তাহারা নিকটবর্ত্তী কোনো এক গ্রামে একটি ছোট বাড়ী কিনিয়া সংসার পাতিয়াছে। সুখের সংসার। গিরীশ কোথাও যায় নাই, সে এই ক্ষুদ্র সংসারটিকে মাথায় করিয়া সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া রহিয়াছে।

বছর খানেক আগে প্রমীলা দিল্লী ও লক্ষ্ণৌতে দুইখানা পত্র লিখিয়াছিল। চিঠিতে জানাইয়াছিল, সে স্রোতে ভাসিয়া যায় নাই, বিবাহ করিয়াছে, এক সম্ভ্রান্ত ঘরের যুবক তাহার স্বামী; কৃতকর্ম্মের জন্য সে এতটুকুও অনুতপ্ত নয়, সে শান্তিতে জীবন নির্ব্বাহ করিতেছে। এই জীবনই তাহার অভিপ্রেত। বলা বাহুল্য, আজ পর্য্যন্ত সে জবাব পায় নাই। পায় নাই বলিয়া দুঃখিতও সে নয়। সে আপন কর্ত্তব্য করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

প্রমীলার কোলে একটি শিশুসন্তান আসিয়াছে, আর একটি আসিবারও সম্ভাবনা। শিশুপুত্রটির বয়স দেড় বছর। সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান সন্তান। মা যখন সন্তানকে চুমা খাইয়া আদর করে, পিতার মনে তখন ঈর্ষা হয়। তাহাদের ভালবাসায় ভাগ পড়িয়াছে।

সংসারে দৈন্য ও দারিদ্র্য নাই, জীবন-সংগ্রামও তাই ছিল না। অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ সুনিয়ন্ত্রিত ও পরিচ্ছন্ন সংসার। বাড়ীর

ভিতরে নানা জাতীয় ফুলের চারা, আয়াপানির কেয়ারি-করা উঠান্, সুমুখে একটি বড় দীঘি, দীঘির ওপারে অশথ-তলার পুরানো মন্দির। মন্দিরে গ্রামের মেয়েরা পূজা চড়াইতে আসে। অশথ্-তলায় বছরে একবার বারোয়ারী রক্ষাকালী পূজা হয়। মন্দিরের পিছন দিকে যে একখানা জীর্ণ বাংলা আজো শীত-বর্ষা উপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ওখানে আগে ছোট ছোট ছেলের স্কুল ছিল, কিন্তু উপযুক্ত সাহায্যের অভাবে ছেলেদের বিদ্যাশিক্ষা স্থগিত রাখা হয়। প্রমীলা মতলব করিয়াছে, তাহারা স্বামী-স্ত্রী মিলিয়া স্কুলটিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া ছেলেদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিবে।

দুইটি শুইবার ঘর, একটি রান্নাঘর, একটিতে ভাঁড়ার থাকে, ওধারে গিরীশের ঘর, কোলে বড় একটা দালান—বৃষ্টি হইলে কাপড় চোপড় ও ছেলের বিছানা শুকাইবার ভাবনা নাই,—উঠানে কূয়া, তাহার পাশে স্নানের ঘর—সেই ঘরটির চালে কুমড়ালতায় হলুদ বরণের ফুল ফুটিয়া থাকে।

'রোদের সময় গাছে জল দিচ্ছ, ভাপ লেগে চারা গাছ আঁউরে যাবে না? কী বুদ্ধি!'

জলের ঝারি থামাইয়া ভবেশ পিছন ফিরিয়া তাকায় বলে, 'কী করি বল, গিরীশটা আর কত পারবে?'

প্রমীলা বলে, 'আমিই না হয় দিতাম গো?'

'তুমি?' বলিয়া তাহার চোখে চোখ মিলাইয়া ভবেশ মৃদু একটুখানি হাসে। প্রমীলা লজ্জায় চোখ নামাইয়া লয়।

'সে কথা বুঝি ভুলে গেছ? সেই কুকু হবার আগে কি যেন করতে গিয়ে রক্ থেকে পড়ে গিয়েছিলে? বাবারে, কত ডাক্তার কত ওষুধ, তবে—'

'সে গল্পটা তুমি কবে ভুলবে বলত? কেবল তার খোঁটা!'

'খোঁটা দেবার জন্যেই ত মনে রেখেছি।' বলিয়া ভবেশ হাসিতে লাগিল। গাছে জল আর সে দিল না, প্রমীলার অবাধ্য সে নয়, ঝারিটা রাখিয়া সে দালানে উঠিয়া আসিল।

'শরীর ভাল নেই বলছিলে যে? বাজারে গেলে, ত্রিফলা আন্‌লে না কেন? ত্রিফলার জল খেলে শরীর ঠাণ্ডা হয়।'

'শরীর আবার গরম হলো কখন?'

'তবে বুঝি মাথা গরম?'

বলিয়া দুইজনেই উদ্ভাসিত হাসি হাসিয়া উঠিল।

কুকুকে স্বামীর কোলে দিয়া প্রমীলা খাতা ও কলম লইয়া হিসাব করিতে বসিয়া গেল। গতকাল পাওনাদারেরা আসিয়া টাকা কড়ি লইয়া গিয়াছে। ধোবা ও মুদী এখনও বাকি, আজ তাহারা হয়ত আসিবে। কয়লাওয়ালার গাড়ী লইয়া আসিবার কথা, টাকা লইয়া সে উধাও হইয়াছে, লোকটার কোনোরূপ দায়িত্বজ্ঞান নাই, আসিলে একবার ধম্‌কাইয়া দিতে হইবে।

'বাড়ী থেকে চাল্ পাঠাতে লিখলাম, সরকার মশাই একটা উত্তরও দিলেন না, কী কাণ্ডজ্ঞান! এখনকার বুড়োরা তরুণ-দের অনুকরণ করচে!'

'চাল্ অত জমিয়েই বা কি হবে, পোকা ধরে নষ্ট হয়। ঝি এলে আজকে দেখবো কতটি আছে।'

'ও গিরীশ, শোনো বলি শোনো, যোগজীবন কি বললে তোমার কাছে? গরুটা ছেড়ে দেবে না?'

গিরীশ আসিয়া কহিল, 'ও রাজি আছে বাবু ছাড়তে, কিন্তু ওই, দু'কুড়ির কম রাজি নয়! বললে, ছ'সেরি গাইটে—'

প্রমীলা কহিল, 'তবে ত রাজা হলাম, ছ'সেরি গাই যেন আর ভূ-ভারতে নেই! পঁয়ত্রিশ কম কি হলো গিরীশ? ছেলের জন্যেই কথা, নৈলে—'

'নৈলে আমারও গরু কেনার সখ নেই।' বলিয়া ভবেশ হাসিল।

প্রমীলা কহিল, 'অন্ততঃ দু'টাকা ওকে কমাতেই হবে, ওরই বা এত জিদ্ কিসের? তুমি বলে দিও গিরীশ।—'

হাত দিয়া ভবেশ স্ত্রীকে থামাইল। কহিল, 'তোমার রক্ত এখনো গরম আছে দেখচি। কী আর হবে, দু'টাকার জন্যে, কাল টাকা দেবো গিরীশ তুমি গরুটা এনো।'

'আচ্ছা।' বলিয়া গিরীশ চলিয়া যাইতেছিল, প্রমীলা আবার তাহাকে ডাকিয়া কহিল, 'অমনি ঘরামিকেও খবর দিও বাবা, চালার কাজটা যেন সেরে দিয়ে যায়। গরু এসে ওঠ্বার জায়গা নেই।'

'আচ্ছা বৌমা।'

গিরীশ চলিয়া গেলে চোখ পাকাইয়া হাসিয়া প্রমীলা কহিল,

'কী বেমক্কা, তোমার এতটুকু হুস্তি-দিগ্যি জ্ঞান নেই, গিরীশের সুমুখে ওই সব কথা বলে? তোমার রক্ত যেন খুব ঠাণ্ডা, কেমন?'

কুকু-র গলার কাছে মুখ লুকাইয়া ধমকটুকু পরমানন্দে উপভোগ করিতে করিতে ভবেশ হাসিতে লাগিল

'আজ কলকাতায় যাবে বলছিলে না?'

'যেতেও পারি একবার।'

'আজ আমার সূতোর গুলি আনা চাই। কতদিন ধরে বলচি বল ত? বেহুঁস মানুষ···কোঁচার খুটে গেরো বেঁধে রাখো যদি মনে না থাকে।'

'মনে থাকে কিন্তু এক সময় ভুলে যাই।'

'এত ভুলই বা হয় কেন তোমার? কোন্ দিকে মন থাকে শুনি?'

ভবেশ মুখ ফিরাইয়া লইয়া একটুখানি হাসিল। কুকুকে আদর করিয়া ছাড়িয়া দিয়া কহিল, 'যাও, দৌড়ে যাও ত কুকু, ওই গিয়ে পাখী ধরে আনো।'

কুকু হাসিয়া টলিতে টলিতে উঠানে নামিয়া পাখী ধরিতে গেল। এতদিনে সে বেশ হাঁটিতে শিখিয়াছে।

'আজ একবার তুমি বাজারে যাবে?'

'বাজারে?' বলিয়া ভবেশ প্রমীলার মুখের দিকে তাকাইল, তারপর আবার মুখ ফিরাইয়া কহিল, 'এখান থেকে অনেকটা দূর, গিরীশকে দিয়ে হয় না?'

'গিরীশ যে সকালে একবার গিয়েছিল। তুমিই এখন একবার যাও বাপু, চারটি তেলের মসলা আর দু'খানা কাপড় কাচা সাবান এনে দাও। কচি পটল যদি পাও ত এনো।'

ভবেশ ভাবিয়া চিন্তিয়া খানিক পরে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল; 'যাই, খানিকটা পথ হাঁটিগে, বসে বসেই বা কি করা যায়।'

প্রমীলা কহিল, 'যাচ্ছ, কিন্তু কোথাও দেরি করো না, একবার পথে পা দিলে তোমার ত আর ফেরবার কথা মনেই থাকে না। রান্নাবান্না নিয়ে বসে থাকা ভারি কষ্টকর।'

'না গো, এখনই আসবো।' বলিয়া একখানা তোয়ালে হাতে লইয়া সে এক-পা এক-পা করিয়া বাহির হইয়া গেল।

'অমনি রাজমিস্ত্রিকে বলে এসো, রবিবার থেকে ইস্কুল ঘরের কাজে লাগবে। একটাকা চার আনাই না হয় রোজ দেবো।'

পিছন ফিরিয়া একবার তাকাইয়া ভবেশ চলিয়া গেল। যতক্ষণ সে দৃষ্টির উপরে রহিল, প্রমীলাও রহিল সেই দিকে তাকাইয়া। বাস্তবিক, এই মানুষটিকে দিয়া কী পরিশ্রমই না সে করায়, অথচ শান্ত নিরীহ সে কোনোদিন প্রতিবাদ করে না। এমনি করিয়াই সে ভালবাসিয়াছে, আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছে। আত্মীয় পরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, সমাজকে বিসর্জ্জন দিয়া, বন্ধুবান্ধবকে এড়াইয়া সে এই ক্ষুদ্র সংসারের মধ্যে আপনাকে গণ্ডীবদ্ধ করিয়াছে। কোথাও তাহার বাধে নাই, কোথাও

অনুতাপ করে নাই,—অত্যন্ত সহজে ও স্বচ্ছন্দে সে এই জীবন স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এই চরিত্রবান যুবকটিকে না পাইলে তাহার জীবন সত্যই ব্যর্থ হইয়া যাইত।

সেদিন কলিকাতা যাইবার সময় প্রমীলা তাহাকে একটা ফর্দ্দ করিয়া দিয়া হিসাব বুঝাইয়া দিল, গণিয়া গণিয়া টাকা দিল হাতে, এবং রাত্রি আটটার মধ্যে যে ফিরিয়া আসিতে হইবে তাহাও সে জানাইয়া দিল। ভবেশ বাহির হইয়া গেল।

জিনিসপত্র, কাপড় চোপড় হাতে লইয়া শ্রান্ত ও ক্লান্ত ভবেশ যখন ফিরিয়া আসিল তখন আটটা বাজিয়া গিয়াছে। কপাল হইতে তাহার ঘামের ফোঁটা নামিয়া আসিতেছিল। পায়ের শব্দ পাইয়া আলো হাতে গিরীশ বাহির হইয়া আসিয়া তাহার হাত হইতে জিনিসপত্র নামাইয়া লইল। পাখা আনিয়া বাতাস করিতে করিতে প্রমীলা কহিল, 'ভয়ে মরি, কল্‌কাতায় আজকাল যে হৈ চৈ!'

ভবেশ মুখের ঘাম মুছিয়া নিশ্বাস ফেলিল। গিরীশ কহিল, 'বাবু, টগরকে নিয়ে ত আর পারিনে, ঝি-গিরি করতে এসেচে কিন্তু মহারাণীর মেজাজ।'

মুখ তুলিয়া ভবেশ কহিল, 'কি হল গিরীশ?'

প্রমীলা কহিল, 'গিরীশ আজ রেগেই খুন, সে আর কি হবে বল।'

'কী হবে কেন বৌমা? দেশে কি ঝি-এর আকাল?

বুঝলেন বাবু, এই রোগা শরীরে বৌমাকে আজ বাসন মাজ্‌তে হলো।'

সহজ কণ্ঠে ভবেশ কহিল, 'তাই নাকি, ভারি অন্যায়!'

'লাটসায়েবের মেয়ে কি না, তাই সপ্তাহে ওর দু'দিন করে ছুটি চাই। সরকারি চাকরিতেও লোকের এত সুবিধে—ওকে আপনি তাড়ান বাবু।'

'তাড়ালে চলবে?'

'খুব, তক্ষুনি আমি নতুন লোক আন্‌তে পারব। বললাম, আমাকে দিন্ বৌমা, আমি বাসন ক'খানা মেজে দিই, কিন্তু উনি কিছুতেই—'

প্রমীলা কহিল, 'পুরুষ মানুষ কি বাসন মাজে, ছি গিরীশ।'

'ও আমাদের অভ্যেস আছে বৌমা, এই ত আপনি যখন আসেন নি, তখন আমিই ত—'

কথাটা শেষ না করিয়াই সে স্বামী-স্ত্রীর দিকে একবার তাকাইল। মনে হইল, এখন সে কথা অনাবশ্যক এবং অসঙ্গত, বলাটা হয়ত ভাল শুনাইবে না, চুপ করিয়া গিয়া আলোটা রাখিয়া সে চলিয়া গেল।

ঘরে উঠিয়া গিয়া ভবেশ জামা কাপড় ছাড়িতে লাগিল।

রাত্রে আহারাদির পর প্রমীলা গিয়া কুকুকে লইয়া একটা বিছানায় শুইল, আজ শরীরটা তাহার ভাল ছিল না। কুকুর শরীরও ভাল নাই, দুরন্ত ছেলে, জল দেখিলে আর রক্ষা নাই, বোধ হয় একটখানি গা গরম হইয়াছে। মাঝে মাঝে তাহার এমন হয়।

'ওষুধ পত্র না পড়লে এ ছেলে দেখচি সারবে না।'

অন্য একখানি খাটে শুইয়া মাথার কাছে আলো রাখিয়া ভবেশ একখানা বই লইয়া গভীর মনোযোগের সহিত পড়িতেছিল। নিস্তব্ধ রাত্রিতে বই পড়ার অভ্যাসটি সে আজও পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। মুখ তুলিয়া কহিল, 'আবার বুঝি জ্বর হলো, কাল না হয় একবার ডাক্তারের ওখানেই নিয়ে যাবো।'

'হোমিওপ্যাথি ওষুধেই বোধ হয় সারবে।'

ভবেশ আর সে কথার জবাব না দিয়া বইখানির প্রতি মনঃসংযোগ করিল। জানালা দরজা খোলা, দক্ষিণ দিক্ হইতে হাওয়া আসিতেছে, রাত ঘন-গভীর, বাহিরে কৃষ্ণপক্ষের স্তিমিত জ্যোৎস্না—ভবেশের ঘুম আসিতেছিল না।

মিনিট পাঁচেক পরে মুখ ফিরাইয়া প্রমীলা কহিল, 'ভাল কথা, তোমার একখানা চিঠি আছে। হাত বাড়িয়ে দেখ ত ওই টেবিলের ওপর, একখানা খাতার তলায়, খামের চিঠি।' বলিয়া সে আবার মুখ ফিরাইয়া চোখ বুজিল।

তাহার নির্দ্দেশক্রমে চিঠি বাহির করিয়া খাম খুলিয়া ভবেশ পড়িতে লাগিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তিত মুখে তন্ময় হইয়া পড়িতে পড়িতে সে স্থির হইয়া রহিল, কোনো সাড়া শব্দ করিতে পারিল না।

চিঠি আসিলে সাধারণতঃ তাহারা দুইজনে আলোচনা করে। কিন্তু বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সাড়া না পাইয়া প্রমীলা মাথা

তুলিয়া স্বামীর দিকে একবার তাকাইল। দেখিল, সুমুখের দেয়ালের দিকে ভবেশ একান্ত দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিয়াছে। দেয়ালে তাহার প্রথম স্ত্রীর ছবিখানি টাঙানো, মায়ার ছবি। কতদিন দেখিয়াছে, মায়ার ছবিখানির দিকে সে কতদিন অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া আত্মহারা হইয়া গিয়াছে। প্রমীলা তাহাতে আনন্দই পাইয়াছে, স্বামীর প্রতি তাহার কেমন করিয়া যেন শ্রদ্ধাই বাড়িয়াছে, সে আরো বেশি করিয়া ভবেশকে ভালবাসিয়াছে। এমন মহীয়সী নারী, যাহাকে তাহার স্বামী আজো ভুলিতে পারে নাই, মনে মনে সেই পরলোকগতা নারীর উদ্দেশ্যে সে প্রণাম জানাইয়াছে।

আস্তে আস্তে উঠিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই ভবেশ তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইল। প্রমীলা কহিল, 'কা'র চিঠি এল বললে না যে? বাড়ী থেকে এল বুঝি?'

ভবেশ কহিল, 'হ্যাঁ, বাড়ী থেকে সরকার মশাই দিয়েচেন। লিখচেন টাকা আর উনি এখন পাঠাতে পারবেন না। একেই ত এবারে তেমন ধান হয়নি, খাজনার টাকাও আদায় নেই, আসচে বছরে টাকা ওঠ্‌বার সম্ভাবনাও কম, এ অবস্থায়—' বলিয়া ভীত ও নিরুপায় দৃষ্টিতে সে প্রমীলার দিকে চাহিল।

'জমিদারীর মজাই এই, হয় বান ডাকে না হয়তো চড়া পড়ে। আমি এত আশা করে রইচি টাকার জন্যে···আর সাতটা দিন হয়ত কষ্টে চল্‌তে পারে। তারপর এই সংসার···'

'তার জন্যে আর ভয় কি?' বলিয়া প্রমীলা পাশে আসিয়া

বসিল। তাহার গায়ের উপর সস্নেহে একটা হাত রাখিয়া কহিল, 'আমার ত সেই ইন্সিওরেন্সের দরুণ টাকাগুলো জমা রয়েছে, টাকা মানুষের খরচের জন্যেই···কালকেই তুলে এনো।'

'জমা টাকা কি খরচ করে প্রমীলা ?'

'তা হোক, আবার জম্‌বে। তুমিই শুধু দেবে, আমি দেব না, এই বা কোন্ কথা ? অত ভেবো না।'

ভবেশ চুপ করিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিল, 'তা এখন না হয় চল্‌বে, কিন্তু কলসীর জল গড়াতে গড়াতেই ফুরোয়। সেদিন যোগজীবনবাবু যে চাকরীটার কথা বলেছিলেন, সেটা একবার চেষ্টা করিগে। পাটের কলে চাকরী বলে সেদিন আপত্তি করেছিলাম, কিন্তু এখন আর সে আপত্তি ···তুমি কি বল ?'

প্রমীলা কহিল, 'কাজ একটা কিছু করা মন্দ নয়, তবে তোমার যে আবার চাকরী করা অভ্যেস নেই ! পারবে ?'

ভবেশ সামান্য একটু ম্লান হাসি হাসিল। তারপর কহিল, 'না পেরে আর উপায় নেই প্রমীলা। বাঁচতে গেলে—'

প্রমীলা মাথা হেঁট করিয়া তাহার কথা শুনিল।

সকাল বেলা কুকুকে কাঁধে লইয়া ভবেশ ডাক্তার দেখাইতে গেল। প্রায় এক মাইল পথ। ঔষধ পত্র লইয়া সে যখন

হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিল তখন তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইতেছে না।

প্রমীলা ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইল। তারপর তাহার ছোট কপালখানির উপর গালটি পাতিয়া কহিল, 'ওমা, এর জ্বর যে বেড়েছে, এবার দেখছি ছেলে একটু ভোগাবে।'

ভবেশ শুধু শুষ্কমুখে কহিল, 'এখন এক ডোজ ঔষধ খাইয়ে দাও, তিনঘণ্টা পরে আর একবার—'

প্রমীলার আন্দাজ মিথ্যা হইল না, ছেলের জ্বর বাড়িয়া চলিল। ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় খুব সম্ভবতঃ জল-হাওয়ার গোলমালে অসুখে পড়িয়াছে। দিন দুই পরে দেখা গেল, কুকু-র গায়ে বসন্তর গুটি বাহির হইয়াছে। ভবেশের চক্ষু স্থির, প্রমীলা কাঁদিয়া খুন। গিরীশ গিয়া শীতলার বামুন অমূল্যকে ডাকিয়া আনিল। দিন এবং রাত্রি দুইজনের চক্ষে একাকার হইয়া গেল। কুকু- আর চোখ মেলিয়া তাকায় না, কিছু খাইতে পারে না, অসহ্য যন্ত্রণা, তারপর দুর্ব্বলতায় নিস্তেজ হইয়া আসিল। ভবেশ কলিকাতায় ছুটাছুটি করিয়া ডাক্তার ও ঔষধে বাড়ীখানা ভরিয়া দিল। চুলায় গেল রান্না-বান্না ও স্নানাহার। কোনোদিন খাওয়া জোটে, কোনোদিন জোটে না। প্রমীলা সেই যে উন্মাদিনীর মত কুকু-র শিয়রে বসিয়া আছে, তাহাকে সেখান হইতে নড়ায় কাহার সাধ্য। ভয়ভীষণা মাতৃরূপা জ্বালাময়ী নারী, বত্রিশটি নাড়ী তাহার চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এমন করিয়া ভবেশ তাহাকে আর কোনোদিন দেখে নাই।

অনেক দুঃখ, অনেক যন্ত্রণার পর একদিন কুন্তু-র জীবনের আশা দেখা দিল। ভয় কাটিয়া গিয়াছে। গিরীশ নিশ্চিন্ত হইয়া কহিল, 'শেতলার দরুণ পাঁচ সিকে পূজো আজ তুলে রাখো বৌমা।'

প্রমীলা কহিল, 'আচ্ছা বাবা।'

ভবেশ তাড়াতাড়ি পকেট হইতে টাকা ও পয়সায় পাঁচ-সিকে গণিয়া প্রমীলার হাতে দিল।

যোগজীবনবাবু যে চাকুরীটির কথা বলিয়াছিলেন তাহা হয় নাই। অনেক হাঁটাহাঁটি অনেক সুপারিশ এবং বহু তোষামোদের পর আর একটি চাকরীর সুবিধা হইল। চট্-কলে কেরানির কাজ। চট্কলের অবস্থা এখন ভাল নয়, অস্থায়ী কাজ, প্রয়োজন ফুরাইলে আবার ছাড়াইয়াও দিতে পারে। আপাততঃ মাসে পঁয়তাল্লিশ টাকা, কাজ দেখাইতে পারিলে পঞ্চাশ হইবার সম্ভাবনা রহিল। তিরিশ টাকা হইলেও ভবেশের আপত্তি ছিল না, পঁয়তাল্লিশে সে সহজেই রাজি হইয়া কাজে লাগিয়া গেল।

মাস কয়েক পরে বন্যার মত এক কন্যা আসিয়া প্রমীলার কোল জুড়িয়া বসিল। সংসার একটু একটু করিয়া ভারি হইয়া উঠিতেছে। গরুর পাট সংসার হইতে তুলিয়া দিয়া প্রমীলা

গোয়ালার নিকট জল মিশানো দুধের ব্যবস্থা করিল। ছেলে-মেয়ে পড়িবার স্কুলে চাঁদা দেওয়া তাহাদের আগেই বন্ধ করিতে হইয়াছে। গিরীশকে তাহারা ছাড়িতে পারে নাই, গিরীশও ছাড়িয়া যায় নাই, অতএব সে আছে। ঠিকা-ঝি দুইবেলা আসিয়া বাসন মাজিয়া দিয়া যায়।

সূতার কাজ ও ছবি আঁকা প্রমীলা জানিত। দুপুর বেলা পাড়ার মেয়েরা তাহার নিকট সেলাইয়ের কাজ শিখিতে আসে। টেবিল-ক্লথ, ছোট ছেলের জামা, সেমিজ, কার্পেটে ঠাকুরের মূর্ত্তি তোলা, এগুলি তাহার দক্ষ হাতে সুন্দর তৈরী হয়। এগুলি তৈরী করিয়া গিরীশের হাতে দিয়া সে বাজারে পাঠাইয়া দেয়। বাড়ীতে বসিয়া রোজগার মন্দ হয় না। সম্প্রতি প্রমীলা একটা সিঙ্গার-মেসিন্ কিনিয়াছে। দিন তাহাদের একরকম মন্দ চলে না।

বেলা দশটার মধ্যে স্নানাহার করিয়া ভবেশকে কলে গিয়া হাজিরা দিতে হয়। দাসত্বে সে অভ্যস্ত নয়, এ তাহার পোষায় না, কিন্তু কী করিবে, সংসার তাহাকে ক্ষমা করে নাই, সে আপন প্রয়োজনে তাহার কাঁধে জোয়াল দিয়া কাজ আদায় করিয়া লইবেই। তাহার মুক্তি নাই।

নূতন চাকরী ক্রমে পুরানো হইয়া আসে। তবু বেলা পাঁচ-টার আগে সে বাহির হইয়া আসিতে পারে না। কলের বাঁশী বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার্ত্ত দিনশ্রমিকরা ছাড়া পাইয়া হল্লা করিতে করিতে বাহির হয়। ইহা তাহাদের আনন্দ নয়, স্বস্তির

নিশ্বাস। নিরুৎসাহ, ভগ্ন, শ্রান্ত স্ত্রীপুরুষের দল। প্রাণের রস নিঃশেষে নিঙড়াইয়া দিয়া তাহারা যন্ত্রের অনন্ত তৃষ্ণাকে দিনের পর দিন তৃপ্ত করে। সেই অগণ্য উৎপীড়িত নরনারীর জনতার ভিতর দিয়া অতি কষ্টে বাহির হইয়া ভবেশ তাহার পরিচিত পথটি ধরিয়া চলিতে থাকে। এই পরিচিত পথটির বাহিরে আর তাহার যাইবার প্রয়োজন হয় না। এই পথটিই বাজার এবং ডাক্তারখানা হইয়া তাহার বাড়ীর দুয়ারে গিয়া ঠেকিয়াছে। এই সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ পথটি ধরিয়াই তাহার দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া চলিতে থাকিবে। একদিন তাহার এ যৌবন চলিয়া যাইবে, মাথার চুল সাদা হইবে, জরা আসিয়া দেখা দিবে, দেহে ও মনে আসিবে বিতৃষ্ণা—কিন্তু সেদিনও এই পথ, ইহার বাহিরে তাহার গতি নাই। মৃত্যু যেদিন আর তাহাকে মার্জ্জনা করিবে না, সেদিন এই পথেই তাহার প্রাণহীন দেহ শ্মশানে গিয়া পৌঁছিবে।

চটকলের পশ্চিম দিকে কলকল্লোলে মা-গঙ্গা বহিয়া যাইতেছেন। পথ ঘুরিয়া ভবেশ আসিয়া তাহার চিহ্নিত জায়গাটিতে বসিয়া নিঃশ্বাস ফেলিল। কিছুদূরে জেটির বড় বাঁধটা এখান হইতে দেখা যায়, এখন কাজ নাই, লোকজন চলিয়া গিয়াছে,—কেবল একখানা মালবাহী ষ্টীমার তাহার ধারে দাঁড়াইয়া অল্প অল্প ধোঁয়া ছাড়িতেছিল। পাশেই একটা অশথ গাছ, তাহার বড় একটা শাখা প্রায় জলস্রোতের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—গাছের পাতার ভিতর শব্দ জাগাইয়া সরসর করিয়া বাতাস

বহিতেছিল। বাঁ দিকে খানিকটা দূরে স্নানের ঘাট, একটা হিন্দুস্থানী লোক হাত দিয়া গা রগ্‌ড়াইয়া স্নান করিতেছে। জলের উপর সকরুণ রক্তরশ্মি ফেলিয়া তখন সূর্য্যদেব অস্ত যাইতেছিলেন। দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে।

এমনি করিয়াই সে প্রতিদিন এখানে আসিয়া বসে। দেখিতে দেখিতে আকাশে মেঘগুলি রাঙা হইয়া উঠে। দূরে জলের উপর দিয়া খেয়া-নৌকা পারাপার করিতে থাকে। কোথাও কোথাও এক আধজন জেলে পান্‌সির উপর হইতে জাল ফেলিয়া মেঠোয়ালি সুরে গান ধরিয়া দেয়। ওপারে গ্রাম-প্রান্তের গাছগুলির উপর দিয়া গোধূলির আলো ম্লান হইয়া আসে।

এই জীবন সত্যই কি তাহার অভিপ্রেত ছিল? গৃহগণ্ডীর বাহিরে বিশাল পৃথিবীকে সে বিসর্জ্জন দিয়াছে,—তা হউক, তবু তাহার বুকের রক্ত দিয়া গড়া এই ক্ষুদ্র সুশৃঙ্খল সুন্দর সংসারটি, এই নিতান্ত নিভৃত আনন্দময় পরমায়ু, প্রমীলার মত মহীয়সী নারীর অকলঙ্ক প্রেম, দুইটি ভালবাসার সন্তান, নিশ্চিন্ত সহজ জীবন,—হাঁ, এই জীবনই তাহার অভিপ্রেত! আবাল্য যে উচ্চ আশাকে সে লালন-পালন করিয়াছে, এই ত তাহার বিকশিত রূপ! আরামের শয্যা, সকালের সুন্দর আলো, রাত্রির অবারিত জ্যোৎস্না, কয়েকখানি সুখপাঠ্য বই, স্বামীগতপ্রাণা নারীর মধুর অনুপ্রেরণা,—সকল স্বপ্ন তাহার সফল হইয়াছে, তাহার নালিশ জানাইবার কিছু নাই, অনুশোচনা করিবার কারণ নাই!

তবু এই কলনাদিনী মা গঙ্গার উপকূলে আসিয়া বসিলেই কেন তাহার বুকের ভিতরটা ভারাক্রান্ত হইয়া ওঠে? এই অনন্তপ্রবাহ নদী, ওই দিগন্তজোড়া আকাশ, অস্তাচলশয্যাশায়ী ওই দিন-দেবতা, গোধূলির রহস্যময় সকরুণ আলো, অদৃশ্যমান ওই খেয়া নৌকার অবিশ্রান্ত পারাপার, ইহারা তাহার রক্তের মধ্যে দিনের পর দিন এমন করিয়া দোলা দেয় কেন? মাঝে মাঝে এক অকল্পিত বেদনা ভিতর হইতে উঠিয়া তাহার কণ্ঠ-রোধ করে কেন? কী তাহার হারাইয়াছে,—কী সে পায় নাই?

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া প্রথমেই তাহার মনে পড়ে মায়ার কথা। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরিয়া মায়া ছিল তাহার স্ত্রী, স্ত্রী ছাড়া সে আর কিছু নয়। বিবাহেই তাহার সহিত প্রথম পরিচয়, তারপর বন্ধনের মধ্যে তাহার সহিত ধীরে ধীরে ভালবাসার সঞ্চার, দিনে দিনে অল্পে: অল্পে সে ভালবাসা দৃঢ় ও গভীর হইল, নাড়ীর পাকে পাকে তাহার সহিত আত্মীয়তা, অতি ঘনিষ্ঠ সে পরিচয়, সুখ দুঃখের সহিত নিবিড়ভাবে জড়ানো; সে প্রেমের প্রকাশ নাই, নিস্তরঙ্গ ও প্রশান্ত। তাহার দিনযাপন, গতিবিধি, ধ্যানধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাহার জীবন ও মৃত্যুর মূলে ছিল মায়ার অদৃশ্য প্রেমের অনু-প্রেরণা। সে ছিল দেহ, মায়া ছিল সেই দেহের শোণিতপ্রবাহ। মায়া ছিল লক্ষ্মীরূপা, তাহার চিত্তের তৃষ্ণাকে উত্তরোত্তর জাগাইয়া তুলে নাই, বরং একটি অপরিসীম পরিতৃপ্তি দিয়াছিল।

তারপর তাহার বিরহের দিনগুলির উপর দিয়া আসিয়া দাঁড়াইল প্রমীলা। হাতে সুধাপাত্র, অঙ্গে অঙ্গে বসন্তের অনন্ত শোভা, মাথার পরে কালো কেশের অরণ্য, হৃদয়ে সাগরের ঐশ্বর্য্য। তাহার হৃদয়ের অন্ধকার দিক্‌দিগন্ত প্রজ্বলিত বিদ্যুচ্ছটায় আলোকিত করিয়া তুলিল। এই মায়াবিনী উর্ব্বশীকে সর্ব্বস্ব দিয়া ভালবাসিতে সে দ্বিধা করে নাই, কার্পণ্য করে নাই। কত বাধা, কত আবর্ত্ত, কত লুকোচুরি, কত দিবাস্বপ্নের আলোছায়া,—দেশদেশান্তর মাড়াইয়া, পথে-বিপথে ঘুরিয়া, মান-সম্ভ্রম, সমাজ, সংস্কার, সংসার সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া সে আবার বিবাহ করিয়া বসিল। বিবাহ করিয়া সে অন্যায় কার্য্য করে নাই, আত্মগ্লানি নাই, আজও তাহারা সুখী, প্রমীলার অনির্ব্বচনীয় প্রেমে তাহার সমস্ত জীবন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, মনে তাহার খেদ নাই, মালিন্য নাই, অনুতাপ নাই !

তবু কোথায় একটা ভয়ানক অভাব তাহার ভিতরে থাকিয়া থাকিয়া টন্ টন্ করিয়া ওঠে! অত্যন্ত সঙ্গোপনে একটি প্রহেলিকাময় প্রশ্ন তাহার অন্তরে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, এ প্রেমকে সে বন্ধনের মধ্যে আনিয়া বরণ করিল কেন? সাগরকে সে সরোবরের মধ্যে আনিয়া বাঁধিল কেন? এ ত মায়া নয়, এ যে প্রমীলা! ইহার পিছনে যে একদিন ছিল তরঙ্গসঙ্কুল গর্জ্জমান মহাসাগর, জ্যোৎস্নাময় নীল নির্ম্মল আকাশ, গোদাবরী নদীর তীর, বনপথের অন্ধকার; একদিন ইহার পিছনে ছিল শস্য-শ্যামল প্রান্তর, নিরুদ্দিষ্ট দুর্গম তীর্থপথ,

ঝিল্লি-মুখরিত দিগন্তবিলীন অরণ্যেরেখা,—অন্তহীন পথের পট-ভূমিকায় আঁকা সেই প্রমীলা আজ কোথায়? এ যে স্থূল রক্তমাংসের স্তূপ, এ যে বোঝা, এ যে বাধা! কোথায় সে-দিনের সেই উল্লাস, সেই দুর্দ্দমনীয় প্রাণাবেগ, অপূর্ব্ব আনন্দময় রোমাঞ্চ? কোথায় সেই বিহ্বল উন্মাদনা, মূঢ় কামনা, বাসনার রঙে রঙীন মনোরম দিবা-স্বপ্ন সেই অফুরন্ত উচ্ছ্বাস? এ নারী যে সন্তানের জননী হয়, এ যে সংসার রচয়িত্রী, ইহার যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, লাভ-ক্ষতি, ন্যায়-অন্যায় সমস্তই বোধ আছে, এ ত সেই প্রমীলা নয়, এ যে নিতান্তই নারী! যাহার নিকট প্রচুর আশা সে করিয়াছিল, সে সামান্য দিতে গিয়াই ফুরাইয়া গেল; অনন্ত তৃষ্ণা মিটাইল একপাত্র পানীয় দিয়া।

অভাব এবং বেদনা সেইখানেই—সেই দিন আর তাহার ফিরিয়া আসিবে না। আকাশের অবারিত মুক্তি হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া যে প্রান্তর-প্রাঙ্গণের মধ্যে আপনাকে বন্দী করিয়াছে তাহার চারিদিকে আজ প্রাচীরের বেড়া। সেই মায়াবিনী অভিসারিকাকে খুঁজিয়া আনা কঠিন, সে উর্ব্বশী দূর অস্তপারে পলাইয়া গিয়াছে। জননী, গৃহিণী এবং সুখশয্যার সঙ্গিনী ছাড়া আজ প্রমীলার আর কোনো পরিচয় দিবার নাই।

কল্পনার রসবিলাস শেষ হইয়াছে, বুকের ভিতরটা খাঁ খাঁ করে, স্তিমিত মস্তিষ্ক, নিরুৎসাহ মন, জরার লক্ষণ পরিস্ফুট, —এক সময় ভিতরে ভিতরে ভারাক্রান্ত হইয়া সচকিত চক্ষে

সে উঠিয়া দাঁড়ায়। কখন্ নদীর উপর দিয়া অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, কখন্ তারায় তারায় আকাশ ছাইয়া গিয়াছে, কখনই বা উঠিয়াছে শুক্লপক্ষের ক্ষীণ চন্দ্রকলা তাহা সে বুঝিতেই পারে নাই, নিশ্বাস ফেলিয়া গা ঝাড়া দিয়া সে ধীরে ধীরে পথের উপর উঠিয়া আসে।

যে কথাটি সে আজ পর্য্যন্ত কাহারও কাছে প্রকাশ করে নাই, এমন কি নিজের মধ্যেও যে কথাটি নাড়াচাড়া করিয়া সে আপন দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেয় নাই, অন্ধকার পথে চলিতে চলিতে সেই কথাটাই তাহার মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারে। মায়াকে লইয়া অনায়াসে আনন্দে সে সংসার করিতে পারিত, সন্তান পালন করিতে পারিত, রোগ-শোক-দুঃখ-দৈন্য ভাগ লইতে পারিত, কিন্তু প্রমীলাকে লইয়া এসব তাহার ভাল লাগে না। তাহার রসের জীবন, রঙের জীবন, রূপ ও বর্ণের ঐশ্বর্য্যময় উজ্জ্বল জীবন যে অকালে শুকাইয়া গেল, তাহার কারণ, প্রমীলা তাহার করতলগত হইয়া গিয়াছে। ইহার পিছনে অন্ধ আবেগে ছুটাছুটি না করিলে আনন্দ নাই; ইহার মোহে ও মমতায়, ইহার ইঙ্গিতে ও ভঙ্গীতে মরীচিকাপ্রলুব্ধ হরিণের মত মুগ্ধ হইয়া না দৌড়াইলে রক্তে রক্তে সেই যৌবন-উন্মাদনা জাগে না, এ নারীর হাতে দান লইবার আর কিছু নাই, এ আর কাঁদায় না, বিরহ বেদনায় আকুল করিয়া তুলে না; সুরে, সঙ্গীতে, গন্ধে, প্রকৃতির আলো-ছায়ায়, আকাশের নিবিড় নীলিমায়, সূর্য্যাস্ত-কালের শেষ-রক্তাভায়,

রাত্রির অন্ধকারে শূন্য শয্যার প্রান্তে নিভৃত বাতায়ন-পথে এ মেয়ে আর স্বপ্নের ইন্দ্রজাল বুনিয়া যায় না,—এই বেদনাই আজ তাহার সকলের চেয়ে বড়, প্রমীলাকে হাতের মধ্যে পাইয়া চিরদিনের মত প্রমীলাকে সে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

পাড়ার একটি মেয়ে আসিয়া গল্প করিতে বসিয়াছিল। মেয়েদের লইয়া বসিয়া সেলাইয়ের কাজ করিতে করিতে প্রমীলার এই সময়টা বেশ কাটে। বেলা অপরাহ্ণ।

জুতা জামা পরাইয়া কুকুকে লইয়া গিরীশ বেড়াইতে বাহির হইতেছিল, প্রমীলা বলিয়া দিল, 'কিছু তরকারি এনো গিরীশ, আজ রাতে রান্নার কিছু নেই।'

'আচ্ছা বৌমা।' বলিয়া কুকুকে কাঁধে লইয়া গিরীশ বাহির হইয়া গেল।

দালানে একটা বেতের দোলা কড়িকাঠ হইতে দড়ি টাঙাইয়া ঝুলানো, তাহারই ভিতর শিশুকন্যাটি ঘুমাইতেছিল। প্রমীলা একবার তাহাতে মৃদু দোলা দিয়া আবার কাজে লাগিয়া গেল।

'সেদিন তোকে দেখতে এসেছিল, কি বলে গেল রে আরতি ?'

আরতি হাসিয়া কহিল, 'বললে পছন্দ হয়নি।'

'পছন্দ হয়নি ?' প্রমীলা তাহার দিকে তাকাইয়া কহিল, 'দূর মিথ্যেবাদী ! তোকেও যদি পছন্দ না হয় তাহলে বাংলা দেশের সব ছেলেকেই আইবুড়ো থাকতে হবে। কী বলে গেল সত্যি বল্।'

আরতি বেশ গম্ভীর মুখে কহিল, 'কি বলে গেল জানো প্রমীলা দি, বললে, লেখাপড়া জানা গাইয়ে-বাজিয়ে শিল্পী মেয়ে আমাদের পছন্দ নয় মশাই।'

বলিতে বলিতে দুইজনেই হাসিয়া উঠিল। আরতি কহিল, 'তোমার মতন আর ক'জনের হয় বল, প্রেমে পড়ে বিয়ে, বিয়ের পরে আবার বিয়ে!'

প্রমীলা কহিল, 'খোঁটা দিলি নাকি?'

'দূর!' বলিয়া আরতি তাহার একটা হাত ধরিয়া আদর করিয়া কহিল, 'এর চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে? তোমাকে দেখে আমাদের চোখ খুলে গেছে, সত্যি আমাদের দেশের মেয়েগুলো—'

'বাইরে কে ডাক্‌চে ছাখ্ ত? ছাড়্ ভাই—' প্রমীলা গলা বাড়াইয়া দরজার দিকে মুখ ফিরাইল।

'তুমি থাকো, বউমানুষ, আমি দেখে আসি।' বলিয়া আরতি উঠিয়া গেল। দরজার কাছে গিয়া আগন্তুককে লক্ষ্য করিয়া কহিল, 'কা'কে চান্?'

'এখানে ভবেশবাবু বলে কেউ থাকেন?'

'থাকেন।'

'তাঁর স্ত্রীর নাম প্রমীলা?'

'হ্যাঁ, কি দরকার আপনাদের?'

'তাঁকে চাই।' বলিতে বলিতে পাশ কাটাইয়া তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিল। আরতি আসিল পিছনে। কিন্তু একটি

মুহূর্ত্তেই কি যেন হইয়া গেল ! ইহাদের গলার আওয়াজ শুনিয়া, এবং ইহাদের প্রবেশ করিতে দেখিয়া প্রমীলার বুকের ভিতরটা ধড়াস করিয়া উঠিয়াছে। আনন্দে অথবা ভয়ে, কিসে যে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। শুধু নির্ব্বাক হইয়া থর থর করিতে করিতে সে স্থিরদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিল, একবার ভিতরে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না।

একটি নবীন যুবক ও একটি বালক ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইতেই সে হঠাৎ আনন্দে প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিয়া দুই ব্যাকুল বাহু বাড়াইয়া তাহাদের দুইজনকেই জড়াইয়া ধরিল। বলিল, 'অজিত, পিণ্টু তোরা এসেছিস্ ? বল্, বল্ তোরা এতদিন আসিস্নি কেন, কেন আসিস্নি বল্ ... ওমা পিণ্টু কত বড়টি হয়েছে, আ মরে যাই,—ও আরতি, এইটি আমার ছোট ভাই, এটি আমার মামার বড় ছেলে। অজিত, বম্বে থেকে কবে এলি রে ? আয়, বোস্ ভাই, আঃ আসতে তোদের কত কষ্টই হয়েচে, এত দূরে—' বলিতে বলিতে আবেগে আনন্দে বিহ্বলতায় উন্মাদিনীর মত সে পিণ্টুর মুখখানি চুমায় চুমায় ভাসাইয়া দিতে লাগিল।

'ছাড়ো দিদি, আমরা বসতে আসিনি।' অজিত কহিল।

প্রমীলা চুলের রাশি সরাইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল।

'বসতে আমরা আসিনি, আপনার লোক যে নয় তার সঙ্গে আত্মীয়তাও করতে আসিনি।'

সমস্ত উচ্ছ্বাস ও আনন্দ চক্ষের নিমেষে কোথায় বিলীন হইয়া গেল। প্রমীলা কহিল, 'তবে এলি কেন?'

অজিত কহিল, 'সবাই আমরা এসেচি কল্‌কাতায়। তোমার এখানে এলাম দেখা করতে—তোমাকে একবার দেখে যেতে। আজকেই আমরা আবার চলে যাবো রাতের গাড়ীতে। তুমি কি করেছ বল ত দিদি? কী ব্যবহার করেছ?'

ইহার এই দৃঢ় তিরস্কারব্যঞ্জক কড়া কথা শুনিয়া ফস্‌ করিয়া প্রমীলা কহিল, 'আমার মুখের ওপর এত সাহসে কথা বলতে পারিস?'

'পারি দিদি, পারি' বলিয়া অজিত পিণ্টুকে কাছে টানিয়া লইল, 'নির্ভয়ে সত্য কথা বল্‌তে একদিন তুমিই শিখিয়েছিলে। বম্বে গিয়েছিলাম তোমারই পায়ের ধূলো নিয়ে, কিছু উন্নতি হয়েছে সে তোমারই সেদিনকার আশীর্ব্বাদে। কিন্তু আজ, আজ তুমি সকলের কলঙ্ক, তুমি আমাদের অপমান, আমাদের লজ্জা!'

উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া প্রমীলা তাহার কথা উড়াইয়া দিল। বলিল, 'নাটুকেপনা করিসনে অজিত, আয় বোস্‌, ছেড়ে দে পিণ্টুকে।'

থর থর করিয়া অজিতের পা দুইটা কাঁপিতেছিল। পিণ্টুকে ছাড়িয়া দিয়া কহিল, 'দিলাম, কিন্তু ও তোমাকে চিনেছে, জল খেয়ে আসি বলে এই বালকের বুক ভেঙে দিয়ে একদিন তুমি পালিয়ে এসেছিলে দিদি, ও সেদিন মনে মনে ভগবানকে জানিয়েছিল—'

ছেলেমানুষ পিণ্টু কান্নাকাটি করিবে না বলিয়াই বোধকরি আসিতে পাইয়াছিল, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গলার আওয়াজ চাপিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এক সময় জামার হাতা দিয়া চোখ মুছিল।

'তুমি বসবে না, তুমি মামার ছেলে, কিন্তু পিণ্টু আমার নিজের ভাই। আয় ত পিণ্টু!'

পিণ্টু আসিল না। প্রমীলা তাহাকে টানাটানি করিল কিন্তু সে হাত ছাড়াইয়া শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রমীলা শেষকালে তাহাকে ধমক্ দিয়া কহিল, 'আয় বল্‌চি শিগ্‌গির, শিগ্‌গির আয়; এক—দুই—তিন—' বলিয়া সে চোখ রাঙাইল।

পিণ্টু নড়িল না।

'এসো ত ভাই লক্ষীটি, সোনা আমার, মাণিক আমার, তুই জানিসনে পিণ্টু, ছেলেমানুষ, ওরে তুই জানিসনে ভেতরে আমার কী হচ্চে······আয়, চলে আয়।' বলিতে বলিতে প্রমীলা চঞ্চল হইয়া উঠিল।

পিণ্টু এবার হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া চোখে হাত চাপা দিল, তবু সে প্রমীলার কাছে আসিল না।

আরতি বিপন্ন হইয়া ইহাদের দিকে এতক্ষণ তাকাইতে-ছিল, এবার সে এই মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দেখিয়া আর দাঁড়াইতে পারিল না, পাশ কাটাইয়া এক-পা এক-পা করিয়া দরজার বাহির হইয়া ছুটিয়া পলাইল।

প্রমীলা মুখ ফিরাইল, জোর করিয়া চোখের জল নিরোধ করিয়া কহিল, 'অজিত, তোরা এলি আমাকে অপমান করতে?'

'অপমান করতে?' অজিত ফাটিয়া উঠিয়া কহিল, 'না, অপমানিত হয়েছি তাই এসেছি জানাতে! এসেছি লুকিয়ে, চুপি চুপি, তুমি জানো না দিদি, তোমাকে দিদি বল্‌তে মাথা কাটা যায়, জানো না তোমার জন্যে আমাদের সব ভেঙে চূরমার হয়ে গেছে, খান্ খান্ হয়ে গেছে! তুমি কী বুঝবে, এত বড় একটা পরিবারের মাথা অপমানে যখন ধূলোয় লুটোয়, বংশের খ্যাতি আর প্রতিপত্তি যখন কলঙ্কে কালো হয়ে ওঠে। আমাদের সুখ শান্তি আরাম-আনন্দ চলে গেছে তোমার সঙ্গে। লোকের চোখে আর আমরা কেউ ভদ্র নয়, সম্ভ্রান্ত নয়, চরিত্রবান নয়, আমাদের বাড়ীর সকল মেয়ের মুখ পুড়ে গেছে। এর পরে আমাদের বেঁচে থাকা যে কী কষ্টকর তা তুমি বুঝবে না।

'অথচ সেই তুমি!' অজিত উদ্বেলিত কণ্ঠে কহিতে লাগিল, 'তুমি ছিলে আমাদের সকলের অহঙ্কার, আমাদের পরিচয়—সেই তুমি, তোমার প্রশংসা, তোমার আদর পেয়ে আমরা ছেলেমেয়ের দল ধন্য হয়ে যেতাম, তোমার নিন্দে যে পে'ল সে দুর্ভাগ্য হ'ল একঘরে·········তুমি ছিলে মাঝখানে, তোমার আলোয় আমরা সবাই ছিলাম উজ্জ্বল –'

প্রমীলা মাথা হেঁট করিয়া শুনিতেছিল। অজিত বলিয়া চলিল, 'আজ আমরা চেয়ে দেখি তোমার সব মিথ্যে, তোমার ধর্ম্ম, তোমার আদর্শ, তোমার নীতি, সমস্ত মিথ্যে। তোমার স্নেহ, ভালবাসা, দয়া, দান—সবের মধ্যে ছিল তোমার জঘন্য দুষ্প্রবৃত্তি—'

'অজিত ?' প্রমীলা মুখ তুলিয়া তাকাইল।

'ভয় আর পাবো না দিদি, ভয় আর শ্রদ্ধা করেছিলাম তোমার চরিত্রকে, সেই চরিত্রকে তুমি হাতে করে' নষ্ট করেছ। তোমার ছায়ায় যারা বেড়ে উঠেচে, তোমার শেকড় থেকে রস টেনে যারা বড় হতে পেরেছে, তাদের আজ কী অবস্থা বল ত? তারা এবার কী নিয়ে দিন কাটাবে? অবিশ্বাস, সন্দেহ, মানুষের ওপর অশ্রদ্ধা, ঘৃণা—এ ছাড়া তাদের আর কী রইল?'

'তোমাকে বক্তৃতা দিতে ডাকিনি অজিত। আমি কী তা আমি জানি। জীবনটা চলে নিজের পথে, বক্তৃতা দিয়ে তার মোড় ফেরানো—'

কিন্তু এই বাইশ বছরের অকলঙ্ক-চরিত্র যুবকটি তাহার এই দার্শনিক তত্ত্বটিকে মানিয়া লইল না। তেমনি করিয়া আবেগ-উচ্ছ্বসিত হইয়া অশ্রুসজল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'অন্য পথে চলে কিন্তু এ পথ নয়। মুক্তিই যদি চেয়েছিলে, আত্মহত্যা কেন করনি দিদি? দেওয়ালে মাথা ঠুকে মৃত্যু এনে কেন প্রতিবাদ জানাওনি? এ তোমার কী কুৎসিত জীবন? তুমি নিলে সম্ভোগ, আর সবাইকে দিলে শাস্তি! একে তুমি বল প্রেম? তোমার আশা করে যারা বাঁচে, তোমার আশ্রয়ে যারা প্রাণধারণ করেছে, তাদের স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা, তাদের শ্রদ্ধা-মায়া-দয়া, তাদের প্রশংসা ও পূজোর চেয়ে তোমার কাছে বড় হ'ল এই পথের সস্তা অবৈধ

ভালবাসা ? অশ্লীলতার মধ্যে যার আরম্ভ, দুর্নীতিতে যার শেষ ? এ বিষ খেয়ে তুমি বাঁচবে কেমন করে দিদি ? আয় পিণ্টু, চলে আয়।'

পিণ্টুকে টানিয়া অজিত পা বাড়াইতেই প্রমীলা মুখ তুলিয়া তাকাইল, তাকাইয়াই রহিল। চোখে হাত চাপা দিয়া অজিত পিণ্টুর হাত ধরিয়া সটান্ বাহির হইয়া গেল।

পিণ্টু ? ওরে এলিনে ?'

এ কণ্ঠস্বর পিণ্টুকে বিভ্রান্ত করিয়া দিল। ফস্ করিয়া দাদার হাত ছাড়াইয়া সে পথের উপরেই একবার ফিরিয়া দাঁড়াইল, ইতিমধ্যে কখন্ যেন তাহার দিদির উপর সমস্ত অভিমান মুছিয়া গিয়াছে। কাঁদিয়া কহিল, 'একবারটি শুনে আসবো দাদা ?'

'না।' বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া অজিত আবার চলিতে লাগিল। পিণ্টু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, আর একটু বড় হইয়া সে লুকাইয়া লুকাইয়া আসিবে। সেই দিদি ত তাহার তেমনই আছে !

আসিল না, ফিরিয়া আর তাহারা চাহিল না, হাতের কাছে আর কোনো অবলম্বন নাই, ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণটির উপর সন্ধ্যার অন্ধকার দল পাকাইতেছে, আকাশে উঠিয়াছে তারা, ষষ্ঠীতলার মন্দিরে আরতির শাঁক-ঘণ্টা বাজিল, চারিদিকে তাকাইয়া প্রমীলা হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে উচ্ছৃঙ্খল হাসি হাসিয়া উঠিল। ডাকিল, 'গিরীশ, ও গিরীশ ? তাইত, এখনো আলো জ্বালেনি ?'

বলিতে বলিতে দ্রুত গিয়া সে দোলার ভিতর হইতে শিশু-কন্যাকে বুকের উপর তুলিয়া লইল। চুমা খাইয়া আদর করিয়া কহিল, 'ও আমার সোনা, ক্ষিদে পেয়েছে? তোর কি নাম রাখ্‌বো বল, পিণ্টু? পিণ্টুই রাখ্‌বো!'

মেয়েটিকে আবার শোয়াইয়া সে বলিয়া উঠিল, 'ওমা, টগর এখনো বাসন মাজতে এল না?' বলিয়া দরজার দিকে তাকাইতে সে দেখিল ভবেশ ভিতরে ঢুকিতেছে।

উঠানে নামিয়া দৌড়াইয়া গিয়া সে ভবেশকে জড়াইয়া ধরিল। অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি তাহার গলার কাছে রাখিয়া ছেলেমানুষের মত বলিয়া উঠিল, 'এলে তুমি, আমি বাঁচলাম, বাঁচলাম, আজ আমার টুঁটি টিপে ধরেছিল।'

'কি হ'ল প্রমীলা? ছি অমনি করে কাঁদতে নেই, এসো ঘরে যাই, এসো লক্ষীটি।' বলিয়া ভবেশ তাহাকে সস্নেহে ঘরে তুলিয়া আনিল।

--শেষ--



উপন্যাসের গ্যালারী

প্রত্যেক সারিতে শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকার সৎসাহিত্যরাজি

থরে-থরে সাজানো !

যোগ্য বর-বধূর জন্য যথাযোগ্য উপহার-গ্রন্থ নির্ব্বাচন করুন। তারপর ফুলশয্যার ফুল-জাগানো লগ্নে নববধূর কম-ক'রে এ রত্ন-সম্ভার তুলে দিয়ে তৃপ্ত হোন্—তৃপ্তি দিন। প্রীতি লাভ করুন—প্রীতি দান করুন !

* * * *

প্রথম সারিতে :

হে মোর মানসী

প্রিয়তমা

বিবাহ বন্ধন

এই তিনখানির স্রষ্টা—**শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়**

* * * *

দ্বিতীয় সারিতে :

মনের মতো মেয়ে

তুমি কি সুন্দর

ক্ষণিকের বন্ধু

এই তিনখানির সৃষ্টিকর্ত্তা—**বুদ্ধদেব বসু**

* * * *

তৃতীয় সারিতে :

প্রিয়ার রূপ

মহীয়সী নারী

সহধর্ম্মিণী

সোনার প্রতিমা

এই চারিখানি উপন্যাসের চরিত্রে প্রাণদান করেছেন—

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

চতুর্থ সারিতে : শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

জীবন সঙ্গিনী

মনের মিল

প্রেয়সী

পঞ্চম সারিতে : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের—ছিনিমিনি

* * * *

তারপর সাজানো শেষ হ'লেই প্রকাশিত হবে :

অমর-কথাশিল্পী—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি থেকে

'দম্পতি'

—আর—

সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী অনুরূপা দেবীর

অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি থেকে

'স্ত্রী'

উপহার-প্রদানেচ্ছু বান্ধব-বান্ধবীদের সসম্মান আহ্বান জানাচ্ছি :

স্বাগত! সুস্বাগত!!